দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৮ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা।। ৪ এপ্রিল ২০১৬।। ২১ চৈত্র - ১৪২২।। যুগাব্দ ৫১১৭।। website : www.eswastika.com ।।

বাংলায় শিশুমন্দির

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ২৯ সংখ্যা, ২১ চৈত্র, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

৪ এপ্রিল - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮

খোলা চিঠি : দ্বন্দ্বমূলক নারদবাদ ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৯

তৃণমূলের সৌজন্যে রাজ্যবাসী পিছনের দিকে এগিয়েছে ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

শিশুমন্দির কর্মসূচির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ : একটি সমীক্ষা ▯ দেবীপ্রসাদ রায় ▯ ১১

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যাভারতীর অগ্রগতি ▯ বিজয়গণেশ কুলকার্ণী ▯ ১৪

পশ্চিমবঙ্গে শিশুমন্দির ▯ বিমলকৃষ্ণ দাস ▯ ১৬

পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে বিদ্যাভারতী ▯ দেবাংশু কুমার পতি ▯ ১৭

সত্যব্রত সিংহ স্মরণে ▯ ১৯

আমাদের সত্যদা ▯ রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ২০

তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশুমন্দির ও সারদা শিশুতীর্থ, সেবক রোড ▯ ২১

রঙিন ছবি ▯ ২২

শিশুমন্দিরের ভাই-বোনদের পাতা ▯ ২৫

রায়গঞ্জ সারদা শিশুতীর্থ থেকে সারদা বিদ্যামন্দির ▯ ২৬

বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদ এক মহান শিক্ষা আন্দোলন ▯ ঋতা চক্রবর্তী ▯ ২৭

কোচবিহারে শিশু শিক্ষায় সারদা শিশুতীর্থ ▯ জগদীশ কার্য্যী ▯ ২৮

পঁচিশ বছরে সিউড়ির সরোজিনী দেবী সরস্বতী শিশুমন্দির ▯ জিতেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ▯ ২৯

অভিভাবক / অভিভাবিকার চোখে শিশুমন্দির ▯ ৩০

প্রাক্তন ভাই-বোনের চোখে শিশুমন্দির ▯ ৩৫

একবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে প্রেরণাপুরুষ ডা: হেডগেওয়ার ▯ বিরাজনারায়ণ রায় ▯ ৪০

প্রকাশিত হবে
১১ এপ্রিল, '১৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১১ এপ্রিল, '১৬

বাংলা নববর্ষ সংখ্যার আকর্ষণ

ভারতীয় জাতীয়তাবোধ

একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি এসে মনে হয় ১৯৩০-এর দশকে বুঝি ফিরে গেছি। অসহিষ্ণুতা, বাক্-স্বাধীনতার কথা বলে আবার সেই দ্বিজাতিতত্ত্বের বাতাবরণ সৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছে। 'ভারতমাতা কী জয়' বলতে অস্বীকার করা হচ্ছে। অন্যদিকে ভোগবাদী পাশ্চাত্য জগৎ এখন দিশেহারা, মধ্যপ্রাচ্যে মৌলবাদী শক্তির রণহুঙ্কার সভ্যতার সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। তাই শুধু ভারতের অখণ্ডতা ও ঐক্যের স্বার্থে নয়, বিশ্বশান্তি ও সংহতির স্বার্থেই ভারতে সুদৃঢ় জাতীয়তাবোধ সম্পন্ন শক্তির বিকাশ একান্ত প্রয়োজন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আগামী নববর্ষ সংখ্যার বিষয়—ভারতীয় জাতীয়তাবোধ। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. সত্যনারায়ণ মজুমদার প্রমুখ।

সংখ্যাটি সংরক্ষণ যোগ্য।। সত্বর কপি বুক করুন।। দাম একই থাকছে— ১০ টাকা।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

সম্পাদকীয়

বিদ্যালয় বিদ্যাগ্রহণের স্থান, দাবি আদায়ের নহে

ভারতবর্ষের সমাজ চিরকাল অধ্যয়ন ও স্বাধ্যায় সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিয়াছে। গুরুত্ব দিয়াছে শিক্ষকসমাজ ও তাঁহাদের বিদ্যাদান সংস্কৃতিকে। সমাজচিন্তকদের ভাবনায় বর্ণশ্রেষ্ঠের স্থান পাইয়াছে শিক্ষকসমাজ। জ্ঞান বিতরণ করিয়া যিনি অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করিয়া থাকেন তিনি শিক্ষক অর্থাৎ শিক্ষাগুরু। তাঁহার কাছে জ্ঞানার্থী হইয়া যে আসে সে শিষ্য অর্থাৎ ছাত্র। ছাত্রকে জ্ঞানবান করিয়া তুলিবার দায়িত্ব শিক্ষকের। আবার ঋদ্ধ হওয়া ছাত্রেরও দায়বদ্ধতা রহিয়াছে। সুপ্রাচীনকাল হইতে ছাত্র-শিক্ষক তাই একত্রে এখনও প্রার্থনা করিয়া থাকেন—'সহ নৌ ভবতু', পরমজ্ঞান আমাদের উভয়কেই আলোর মতন জড়াইয়া ধরিয়া রক্ষা করুন। 'সহ নৌ ভুনক্তু'—জ্ঞান সম্ভোগের আনন্দ আমরা যেন একত্রে অনুভব করিয়া থাকি। 'সহ বীর্য করবাবহৈ'—যেন আমরা একসঙ্গে আত্মশক্তি প্রকাশ করিয়া থাকি। 'তেজস্বি নৌ অধীতমস্তু'—আমরা যেন একত্রে জ্ঞানতেজে জ্বলিয়া উঠি। 'মা বিদ্বিষাবহৈ'—যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। অর্থাৎ শিক্ষক সস্নেহে বিদ্যা দান করিবেন। ছাত্র শ্রদ্ধায় মন প্রাণ আবেগ একাগ্র করিয়া সেই বিদ্যা গ্রহণ করিবে। বিদ্যা তখনই বীর্যবতী হইয়া উঠিবে। হইবে ফলপ্রসূ। তবে শুধুমাত্র বিদ্যা বা জীবন ধারণের জন্য জ্ঞানলাভ ভারতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে। প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জনে সেই শিক্ষার সার্থকতা। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য মনুষ্যধর্মের সুসমঞ্জস অনুশীলন। 'ধর্মতত্ত্বে' এই অভিমত প্রতিষ্ঠা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র আরও বলিয়াছিলেন, 'স্বদেশপ্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা উচিত।' কিন্তু সাম্প্রতিককালে আমরা ইহার বিপরীত কার্যকলাপ দেখিতেছি। দিল্লীর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দরাবাদের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলকাতা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় দেশবিরোধী কার্যকলাপের ঘাঁটি হইয়া উঠিয়াছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশের ছাত্র সমাজই ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছিল। ছাত্রসমাজের স্বদেশপ্রীতি লইয়া কাহারও কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আজ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের অশুভ প্রভাবে ছাত্রসমাজের দেশপ্রেম লইয়া প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়াছে। রাজনৈতিক দলাদলি শিক্ষা প্রাঙ্গণকে বহুদিন কলুষিত করিয়াছে, কিন্তু বর্তমানে দেশবিরোধী কার্যকলাপে শিক্ষা অঙ্গন কলুষিত। তবে কি এই শিক্ষা অঙ্গনগুলি ব্যর্থ? গুরু এবং শিষ্য উভয়েই এইস্থানে তাহাদের অধীত লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত? শিক্ষা এই স্থানে অশিক্ষায় রূপান্তরিত হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে বিদ্যালয় বিদ্যা গ্রহণের স্থান, দাবি আদায়ের মঞ্চ নহে। বিদ্যা বিনয়ী হইতে শিক্ষা দেয়। কিন্তু আজ ছাত্রসমাজের মধ্যে যে ঔদ্ধত্য দেখা যাইতেছে তাহা সুশিক্ষার লক্ষণ নহে। বিদ্যাবিহীন শিক্ষা দেশ এবং সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। উল্লেখ্য, ভারতীয় বিদ্যাশিক্ষার সুপ্রাচীন ধারাগুলিকে বর্জন করিয়া স্বাধীনোত্তর যুগে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে তাহা বৃত্তিনির্ভর। বৃত্তিলাভের আশায় তাই যে কোনো উপায়ে ডিগ্রি অর্জন চলিতেছে, জ্ঞান এই ক্ষেত্রে বাহুল্য মাত্র। তবুও কয়েকটি স্থানে আজও প্রকৃত জ্ঞানচর্চা চলিতেছে, সেই স্থানে ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়েই জ্ঞান চর্চায় রত। পার্থিব বিদ্যা শিক্ষা সত্ত্বেও সেইস্থানে শিক্ষা মূলত পারম্পরিক। আত্মোন্নয়নই সেইখানে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। বিদ্যাভারতীর সরস্বতী বা সারদা বিদ্যামন্দির যাহার অন্যতম উদাহরণ।

সুভাষিতম্

পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনং।
কার্যকালে সুমৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ ধনং।।

পুস্তকে লিখিত বিদ্যা, অন্যের হাতে যাওয়া সম্পদ প্রয়োজনের সময় কাজে আসে না।

কোনো অঘটন না ঘটলে অসমে বিজেপি জোটই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে

সাধন কুমার পাল ॥ অসমে এর আগে কখনো এবারের মতো জটিল নির্বাচনী পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দল ২০০১ থেকে ক্ষমতায়। টানা ১৫ বছর ধরে মসনদে থাকার জন্য প্রবল প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া উঠবে এটাই স্বাভাবিক। বিধানসভায় ১২৬টির মধ্যে বিজেপির সদস্যসংখ্যা মাত্র পাঁচ হওয়া সত্ত্বেও ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি অসমে মোট ১৪টির মধ্যে ৭টি লোকসভা আসন দখল করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। দু'বছর আগে ঘটে যাওয়া লোকসভা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেই যে বিধানসভায়ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে এমন কোনো কথা নেই। তবুও নানা কারণে এবারের নির্বাচনে বিজেপিই যে ক্ষমতা দখলের দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে একথা বিজেপি বিরোধীরাও অস্বীকার করছেন না।

অসমে ভোট প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বিগত ১৫ বছর ধরে টানা ক্ষমতায় থাকার জন্য কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ এখন চরমে। বিশেষ করে কংগ্রেসের নেতাদের লাগামহীন দুর্নীতি মানুষকে বিরক্ত, বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। প্রতিশ্রুতি মতো উন্নয়ন করতে না পারাও মানুষের ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হওয়ার একটি বড় কারণ। যেমন ২০১১-র নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া প্রতিশ্রুতির হাজার কোটির প্যাকেজের মাত্র ৩২ শতাংশ বরাক ভ্যালি পেয়েছে। বাকি ৬৮ শতাংশের কোনো খোঁজ নেই। গত ১৫ বছরে অসমের যোগাযোগ ব্যবস্থা এতটাই সঙ্গীন হয়ে উঠেছে যে খানাখন্দে ভরা রাস্তাঘাটের কথা মনে পড়লেই মানুষ আতঙ্কিত হয়। বিভিন্ন মহাসড়কগুলির কাজও চলছে অত্যন্ত ধীর গতিতে। রাজ্য সরকারের গড়িমসির জন্য বনবিভাগের ছাড় পত্র না মেলায় বালাছাড়া-হারাঙ্গাজাও-য়ের ৩২ কিলোমিটার এলাকার রাস্তার কাজ আটকে রয়েছে।

বিজেপির এগিয়ে থাকার একটি বড় কারণ সর্বানন্দ সোনোয়াল ও হিমন্তবিশ্ব শর্মার মতো দুই তরুণ নেতার উপস্থিতি। তরুণ প্রজন্মের অসমিয়াদের কাছে এই দুই নেতার জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব বদলায়নি। কংগ্রেসের একমাত্র মুখ বলতে ৮২ বছরের বৃদ্ধ তরুণ গগৈ। এক সময় হিমন্তবিশ্ব শর্মা যখন কংগ্রেসে ছিলেন সে সময় তরুণ প্রজন্মের এই প্রোগ্রেসিভ নেতা সহজেই বিভিন্ন জটিল সমস্যার সমাধান করেছেন। এখন এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে কংগ্রেসকে টেনে তোলার মতো কেউ নেই বললেই চলে। রাজ্যের তরুণ প্রজন্মের উঠতি হিন্দু ভোটারদের সিংহভাগই বিজেপির দিকে ঝুঁকে রয়েছে। নরেন্দ্র মোদী তাদের সামানে আইকন। হিমন্তের মতো ডায়নামিক নেতার বিজেপিতে অন্তর্ভুক্তি এই তারুণ্যের ছবিতে বাড়তি সংযোজন।

অগপ ও হাগ্রামা মহিলারি নেতৃত্বাধীন বড়োল্যান্ড পিপলস ফ্রন্টের (বিপিএফ) সঙ্গে জোট বিজেপিকে যে অনেকটা এগিয়ে রাখবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এতদিন অগপ-র ভোটাররা বিজেপি ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দিত। এবার সেই ভোট বিজেপির ঝুলিতে যাবে। ২০০৬ থেকে বিপিএফ বড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়্যাল অটোনমাস ডিস্ট্রিক (বিএটিডি)-এ ক্ষমতায় আছে। রাজ্য বিধানসভায় ১২টি আসন নিয়ে বিপিএফ এতদিন কংগ্রেসের সঙ্গে জোটবদ্ধ অবস্থায় ছিল। বিএটিডি এলাকার উন্নয়নে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে ২০১৪-র জুন মাসে বিপিএফ এই জোট থেকে বেরিয়ে আসে।

অন্যান্য রাজ্যের মতো মোদীর প্রগতিশীল ইমেজ অসমে বিজেপিকে একটি জায়গা করে দিয়েছে। রাম মন্দির নির্মাণ, গো হত্যা নিষিদ্ধকরণ, বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ বন্ধ ও অনুপ্রবেশকারী বিতাড়নের মতো ইস্যুগুলি বিজেপির পক্ষে জনজোয়ার আনতে ও হিন্দুভোট এককাট্টা করতে সক্ষম হয়েছে। সদ্য কংগ্রেস-ত্যাগী হিমন্তবিশ্ব শর্মাও এই বলে হুমকি দিয়ে রেখেছেন যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে ১৯৭১-এর পরে যে সমস্ত মুসলিম অনুপ্রবেশকারী অসমে প্রবেশ করেছেন তাদের বহিষ্কার করা হবে।

ধনকুবের বদরুদ্দিন আজমলের এআইইউডিএফের উত্থান বিজেপির জয়ের পথকে সুগম করতে পারে। ১৮ জন বিধায়ক নিয়ে বর্তমান বিধানসভায় এআইইউডিএফ প্রধান বিরোধী দল। কংগ্রেসের বিধায়ক সংখ্যা ৭৮। অসমে প্রায় ৩৫ শতাংশ মুসলমান ভোট। ২০০৪ সালে এআইইউডিএফ প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাঙলাভাষী মুসলমানরা (পড়ুন অনুপ্রবেশকারীরা) সর্বাত্মকভাবে এই দলের দিকে ঝুঁকলেও অসমীয়াভাষী মুসলমানদের একটি ভালো অংশ কংগ্রেসের সঙ্গেই ছিল। কিন্তু বিজেপির উত্থানের পর থেকে হিন্দুভোট যত একাট্টা হতে থাকে সামগ্রিক ভাবে মুসলমানদেরও ভোটদানের ধরন পাল্টাতে থাকে। ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনে শুধুমাত্র ধুবরী লোকসভা আসনে জয়ী হলেও ২০১৪ লোকসভায় ধুবরী, বরপেটা ও করিমগঞ্জের মতো তিনটি লোকসভা আসন ছিনিয়ে নেয় এআইইউডিএফ। ২০০৬-এর বিধানসভায় ১০টি আসনে জয়ী হলেও ২০১১-র বিধানসভায় এআইইউডিএফ ১৮টি আসনে জয়ী হয়। ২০১১ সালে আজমলের দল ১২.৬ শতাংশ ভোট পেলেও ২০১৪-তে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৫ শতাংশে। ২০১৪-র লোকসভার হিসেবে এই দল ২৪টি বিধানসভা আসনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। বদরুদ্দিন আজমলের দলের এই জয়যাত্রা অব্যাহত থাকলে বর্তমান বিধানসভায় ৩০-৩৫টি আসন পেলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

৮২ বছর বয়সেও তরুণ গগৈ মুসলমান ভোটারদের মন জয় করার জন্য ছুটে বেড়ালেও বদরুদ্দিন আজমলের জয়যাত্রা ঠেকাতে পারবেন বলে মনে হয় না। কারণ পারফিউম ব্যবসায় যার দুই হাজার কোটি টাকার লেনদেন, যিনি এশিয়ার বৃহত্তম চ্যারিটেবল চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান হাজি আব্দুল মজিদ মেমোরিয়াল হসপিটাল চালান এবং এশিয়ায় সবচেয়ে ধনী এনজিওর কর্ণধার ও ধর্মগুরু ইমেজ সম্পন্ন, সেই ধনকুবেরকে মুসলমান ভোটারদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব ব্যাপার।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে এই ধনকুবেরের তত্ত্বাবধানেই ২০০১-এর অসমের মুসলমান জনসংখ্যা যেখানে ছিল ৩০.৯ শতাংশ, ২০১১ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৩৪.২ শতাংশ। ২০০১ সালে অসমে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলার সংখ্যা ছিল ৬টি, ২০১১-তে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯টিতে। বদরুদ্দিন আজমলের নেতৃত্বে মুসলমানদের অসম দখলের পরিকল্পনা হিন্দুদের শঙ্কিত করে তুলেছে। এখনো অসমে ৬৫ শতাংশ হিন্দু ভোটার। আজমলের মুসলমান ভোটব্যাঙ্কে থাবা বসানো যে অসম্ভব ব্যাপার এই বিষয়টি তরুণ গগৈ-য়ের মতো পোড় খাওয়া রাজনীতিকের না বোঝার কথা নয়। আজমলের দলের সঙ্গে জোট বাঁধলেও হিন্দুভোট হারিয়ে আম ও ছালা দুটোই যাওয়ার সম্ভাবনা। ঠিক এই কারণে জোটের কথা শুরু করেও শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসকে পিছিয়ে আসতে হয়।

দুই শিবিরে বিভক্ত অসমের ভোট চিত্রে স্পষ্টতই কংগ্রেস ক্রমশই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। তবে বদরুদ্দিন আজমলের জনপ্রিয়তা মূলত লোয়ার অসম ও বরাক ভ্যালিতেই সীমাবদ্ধ। অধিক আসন সংখ্যা বিশিষ্ট আপার অসমে মুসলমান ভোটাররা কংগ্রেসের দিকেই ঝুঁকবে এমন সম্ভাবনাই বেশি। কারণ আনুষ্ঠানিক জোট না হলেও মুসলমান ভোটাররা যেখানে এআইইউডিএফ-এর প্রভাব কম সেখানে কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার মতো মানসিকতা তৈরি করে ফেলেছে এমনটাই শোনা যাচ্ছে। এছাড়াও কংগ্রেসের আরেকটি ভরসার জায়গা হলো খুব সামান্য সংখ্যায় হলেও অগপ ও বিজেপির বিক্ষুব্ধ ভোটাররা। সব মিলে বলা যায় এবারের বিধানসভা নির্বাচনকে অসমের হিন্দুরা কতটা অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই হিসেবে নেবে তার উপরই নির্ভর করছে বিজেপির জয়ের পথ কতটা মসৃণ হবে।

বাবা রামদেবের বৈদিক শিক্ষা নীতির প্রস্তাব নিয়ে ভাবছে কেন্দ্র সরকার

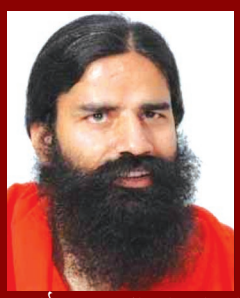

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২২ মার্চ যোগগুরু বাবা রামদেব প্রস্তাবিত দেশের প্রথম বৈদিক এডুকেশন বোর্ড প্রতিষ্ঠা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় এক বৈঠকে মিলিত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি নৃপেন্দ্র মিশ্র এই বৈঠকে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের সেক্রেটারি অফ স্কুল এস সি কুন্তিয়া এবং উচ্চ শিক্ষা সচিব ভি এস ওবেরয়-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে জাতীয় স্তরে বৈদিক শিক্ষা সংসদ (VEB) গঠনের কথা আলোচনা করেছিলেন। সারা দেশে প্রথাগত গুরুকুল শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষার মেলবন্ধন সম্ভব কিনা তা খতিয়ে দেখতেই এই বৈঠক। উল্লেখ্য, এই প্রস্তাব রামদেব পরিচালিত 'বৈদিক গবেষণা সংস্থা' থেকে দেওয়া হয়েছিল। তাদের মতে এই শিক্ষানীতি মহর্ষি দয়ানন্দের শিক্ষা, ঋষি অরবিন্দের মানবিক শিক্ষা, বিবেকানন্দের বেদান্ত শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষার মিশ্রণ। ভিইবি-র অনুমোদিত স্কুলে বিভিন্ন ভাষার মাধ্যমে (সংস্কৃত, হিন্দি, ইংরেজি) বেদ, উপনিষদ, গীতা পড়ানো হবে। প্রস্তাবিত সংসদের রূপরেখা হবে প্রচলিত সিবিএসসি-র মতোই পরিকাঠামোযুক্ত। এই শিক্ষা ব্যবস্থার মডেল হিসাবে হরিদ্বারের 'বৈদিক গবেষণা সংস্থা'কে গণ্য করা হচ্ছে। বিস্তারিত পরিকাঠামো ও পাঠ্যক্রম অবশ্য এখনও আলোচনা স্তরে।

কলকাতার জি ডি বিড়লা সভাগারে একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত বক্তব্য রাখছেন।

উবাচ

“আমরা চাই সারা বিশ্ব ভারতমাতা কী জয় বলুক। আমরা ভারতকে সমৃদ্ধ, শোষণমুক্ত, আত্মমর্যাদাপূর্ণ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। এই জন্যই আমরা ভারতে বসবাস করি।”

মোহনরাও ভাগবত
সরসঙ্ঘচালক
আর এস এস

কলকাতায় এক পুস্তক প্রকাশের অনুষ্ঠানে।

“শুনেছিলাম, কংগ্রেসে টাকা খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে, যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো কিছু হাতিয়ে নেওয়ার অভ্যাস রয়েছে। কিন্তু আমার এটা জানা ছিল না, কংগ্রেস সরকার এত সুন্দর দ্বীপকেও খেয়ে নিতে পারে।”

নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী

অসমের মাজুলিতে নির্বাচনী জনসভার ভাষণে।

“হাওয়ালা কেলেঙ্কারিতে আদবাণী নিষ্কলঙ্ক প্রমাণিত হয়ে ফিরে এসেছিলেন। তৃণমূলেরও তাই উচিত ছিল।”

দীনেশ ত্রিবেদী
তৃণমূল সাংসদ

“কেউ আমাকে বলতে পারবে না যে আমি কোনো মুসলমানকে সাক্ষাৎকার দিয়েছি।”

২০১৩ সালে বিবিসি টুডে-র উপস্থাপক মিশেল হুসেন সম্পর্কে নোবেল প্রাইজ উইনার শীর্ষক একটি বই প্রকাশের পর।

আন সান সু কি
মায়ানমারের নেত্রী

“বিশুদ্ধ জল তা মাটির উপর বা নীচের হোক, কিংবা বৃষ্টি ধরা জলাধার হোক, প্রত্যেকটা কাজে তা ব্যবহার করা যাবে না। না হলে আমাদের দেশে ব্যাপক জলসঙ্কট শুরু হবে।”

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এর আইডিয়া এক্সচেঞ্জ অনুষ্ঠানে।

উমা ভারতী
কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রী

দ্বন্দ্বমূলক নারদবাদ

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

ভোট সমাসন্ন। কিন্তু ভোট দিতে যাওয়ার আগে একবার চিনে নিন রাজ্যের শাসক দলকে। যে দলটা নারদ কাণ্ডের পরে দু-টুকরো। প্রধানমন্ত্রী রাজ্যে এসে বলেছেন 'পহলে সারদা অব নারদা'। তার আগে দলটাই দু-ভাগ। পাওয়া-দল। না-পাওয়া-দল।

একদিকে তৃণমূল (অনুদান)। অন্যদিকে তৃণমূল (সাধু)। একদিকে ক্যামেরার সামনে হাত বাড়িয়ে টাকার বান্ডিল নিতে ব্যস্ত সৌগত রায়, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সুলতান আহমেদ, ফিরহাদ হাকিম, শোভন চট্টোপাধ্যায়েরা। অন্য দিকে, দীনেশ ত্রিবেদী, সুগত বসু, সুব্রত বক্সি, অমিত মিত্রেরা। মাঝখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রেখে সততার প্রশ্নেই কি আড়াআড়ি ভেঙে যাচ্ছে তৃণমূল? নইলে এই দু'পক্ষের কেউ কেন একান্ত আলোচনায়, কেউ প্রকাশ্যে অন্যপক্ষের সমালোচনা করছেন? কোনো সরকারি সংস্থা এখনও 'নারদনিউজ ডটকম'-এর ভিডিও ফুটেজের 'সত্যাসত্য' যাচাই করেনি ঠিকই, কিন্তু সেটি নিয়ে শাসকদলের ভিতরে যে উচাটন মনোভাব তৈরি হয়েছে, তা স্পষ্ট। একেকজন ওই ঘটনায় একেকরকম বক্তব্য পেশ করছেন। দলনেত্রী মমতা যখন ওই ভিডিও ফুটেজের 'অস্তিত্ব'ই স্বীকার করছেন না, তখন ইতিউতি দলের নেতা-মন্ত্রী-প্রার্থীরা মুখ খোলায় প্রকারান্তরে প্রমাণিত হচ্ছে, ওই ফুটেজ 'অস্তিত্বহীন' নয়। সৌগত রায় তো ক্ষমাই চেয়ে নিয়েছেন।

এর মধ্যে দীনেশ ত্রিবেদী সরাসরিই বলেন, 'আমি দলের সভাপতি হলে নির্দোষ প্রমাণ হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্তদের ঘরে বসে থাকতে বলতাম!" শুধু তা-ই নয়, দীনেশ আরও জানিয়েছেন, যে সমস্ত অভিযুক্তেরা গোপন ক্যামেরা অভিযানে জড়িয়ে পড়েছেন, তাঁরা 'নির্দোষ' হলে তাঁদের নিজেদেরই ওই ঘটনায় তদন্ত দাবি করা উচিত ছিল!

দীনেশের ওই মন্তব্য সরাসরি মমতাকেই চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলল। কারণ, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারপার্সন (সভাপতি) মমতা নিজেই। সহ-সভাপতি হিসাবে তৃণমূলের ওয়ার্কিং কমিটিতে রয়েছেন দীনেশ।

প্রসঙ্গত, 'নারদনিউজ ডটকম' যে ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ করেছে, তা নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে 'বিদ্রোহ' শুরু করেছিলেন দীনেশই। সঙ্গে পেয়েছিলেন অপর সাংসদ সুগত বসুকে। দীনেশ বলেছেন, ''দলের সম্পর্কে বলতে পারব না। কিন্তু আমি নিজের সম্পর্কে বলতে পারি যে, স্বয়ং ঈশ্বরও তা চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন না!" পাশাপাশিই তিনি জানিয়েছেন, দলের নিচুতলার কর্মীরা সৎ। সৎ একেবারে উঁচুতলাও। অর্থাৎ মমতা।

দীনেশ যা বলেছেন, তা দল ও নেত্রীর মতের একেবারে বিপরীত। ঘুষকাণ্ডে দেখানো ভিডিও ফুটেজকে 'জাল' বলে চিহ্নিত করে দিয়েছেন মমতা। দলনেত্রীর সেই অবস্থানের ভিত্তিতেই তা নিয়ে তদন্তের দাবি খারিজ করে দিয়েছেন অন্য নেতারা। ওই 'অবস্থান' নিয়ে আগেই আপত্তি জানিয়েছিলেন দীনেশ। এদিন তিনি আরও আলোড়ন ফেলে দিয়েছেন দলের অন্দরে।

বেসরকারি ওই সংবাদসংস্থার ভিডিও'য় দেখা গিয়েছে, দলের পাঁচ সাংসদ, দুই মন্ত্রী, কলকাতার মেয়র ও ডেপুটি মেয়রকে। ভিডিও'য় দাবি করা হয়েছে, শাসকদলের ওই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা সকলেই ওই সংস্থার কাছ থেকে পাঁচ লক্ষ করে টাকা নিয়েছেন। প্রাথমিকভাবে এই ছবির সত্যতা অস্বীকার করেছে তৃণমূল। গোড়ায় দলের প্রথমসারির নেতারা এই গোটা বিষয়টিকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তারপর ভিডিও'য় দেখানো ছবিকে 'জাল' বলে দাবি করেছেন দলনেত্রী স্বয়ং। এই টানাপড়েনের মধ্যে এ ব্যাপারে কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা শুরু হয়েছে। সেই মামলায়ও ভিডিও ফুটেজ চেয়ে পাঠানো হয়েছে। এ সবের মধ্যেই দলের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলে গোটা ঘটনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছেন দীনেশ।

নারদ-কাণ্ডে যে দলের অন্দরের কঙ্কাল একের পর এক প্রকাশ্যে এসে পড়ছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে, দলের অন্দরে নারদ-কাণ্ড নিয়ে বিভ্রান্তি চরমে! সেজন্যই বিধানসভা ভোটে প্রার্থীদের মধ্যে ওই ঘটনায় যাঁরা জড়িয়ে পড়েছেন, তাঁদের প্রকাশ্যে কোনো বক্তৃতা করতেও নিষেধ করে দিয়েছেন দলনেত্রী মমতা। নির্দেশ গিয়েছে, যা বলার তিনিই শুধু বলবেন। বাকিরা পদযাত্রা করেই প্রচার সারবেন। সেই মতোই ওই নেতা-মন্ত্রী- বিধায়কদের কাউকে সভাসমিতিতে দেখা যাচ্ছে না।

কিন্তু তাতেও দলের অন্দরের অভিযোগ, অনুযোগ এবং বিভাজনকে আড়াল করা যাচ্ছে না যে!
দিদির দল অটুট আছে তো?
বিধানসভা ভোটের মুখে
এটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

— **সুন্দর মৌলিক**

তৃণমূলের সৌজন্যে রাজ্যবাসী পিছনের দিকে এগিয়েছে

সম্প্রতি খড়্গপুর সদরে বিজেপি প্রার্থী ও দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের সমর্থনে ডাকা নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ''রাজ্যের মানুষ পরিবর্তন চেয়ে পাঁচ বছর আগে সরকার পাল্টে ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আমিও ভেবেছিলাম ৩৪ বছরের কুশাসন মুক্ত হয়ে বাংলায় সুদিন ফিরল। কিন্তু পাঁচ বছর পর মনে হচ্ছে বামেরা ৩৪ বছরে যা সর্বনাশ করেছে, তৃণমূল মাত্র পাঁচ বছরে তা করে দেখিয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানে পশ্চিমবঙ্গ এখন সব রাজ্যের পিছনে। বিগত ৩৪ বছরে বাংলার উন্নয়ন ধ্বংস হয়েছে। আর গত পাঁচ বছরে বাংলা খণ্ডহর হয়ে গেছে। মা-মাটি-মানুষের কথা বলে এরা আসলে মানুষের মনটাই ভেঙে দিয়েছে। একটা সময় সারা দেশের চালিকাশক্তি ছিল বাংলা। সেই রাজ্যের দশা এখন সারা দেশে সবচেয়ে খারাপ। এই রাজ্যে সব শিল্পকারখানা বন্ধ। শুধু বোমা তৈরির কারখানা চলছে। আপনারা কি এই পরিবর্তন চেয়েছিলেন?''

তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন যে মা-মাটি-মানুষের যে উন্নয়ন তিনি করেছেন তারই প্রতিদানে তাঁর দল ভোট পাবে। বলেছেন, '১০০ বছরের উন্নয়ন আমি পাঁচ বছরে করে দিয়েছি। এই নিয়ে দেশ বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করা উচিত। কারণ, সারা পৃথিবীতে ১০০ বছরের কাজ মাত্র পাঁচ বছরে কেউ কোনোদিন করেনি। করতে পারবেও না।' খড়্গপুরের জনসভায় মোদী এই হামবড়াইয়েরই জবাব দিয়েছেন। ১৯৬৭ সালে শাসকদল কংগ্রেসের মহাবিপর্যয়ের আগে রাজ্য কংগ্রেসের সুপ্রিমো প্রয়াত অতুল্য ঘোষ ভোট প্রচারে অনেকটা এইভাবেই বলতেন, 'কাজ করেছি তাই ভোট চাইছি। কংগ্রেস উন্নয়ন করেছে, দুর্ভিক্ষ ঠেকিয়েছে, সুশাসন দিয়েছে। তাই আপনারা কংগ্রেসকে ভোট দেবেন।' অতুল্য ঘোষের সেই ভোট প্রচার ৫০ বছর পরে অবিকল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় বাংলার মানুষ

গূঢ়পুরুষের কলম

শুনছেন। মমতা ভোট বাজারে বলছেন, জোট ঘোঁট বিজেপি আমাদের কাঁচকলা করবে। ৫০ বছর আগে এই কাঁচকলা কথাটিও ফিরে এসেছিল ভোটের পরে। কংগ্রেসকে হারিয়ে বিরোধী বামপন্থীরা গ্রাম শহরে কাঁচকলার মালা সাজিয়ে ছিল পথের মোড়ে মোড়ে। এবারেও কি আমরা অপেক্ষা করবো রাজ্যজুড়ে কাঁচকলার মালা দেখার জন্য? কারণ, সাধারণ বুদ্ধিতে বলে কাঁচকলার রাজনীতি দিয়ে ভোটে জনসমর্থন পাওয়া যায় না।

মমতার দাবি মতো রাজ্যে উন্নয়নের বান ডেকেছে তার কতটা সত্য আর কতটা মিথ্যা সেটাও ভেবে দেখা দরকার। তৃণমূলের কট্টর সমর্থক পেশাদার অর্থনীতিবিদ অভিরূপ সরকার মশাই বিস্তর প্রবন্ধ লিখে দাবি করেছেন উন্নয়নের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ এখন দেশের প্রথম সারিতে। তাও মাত্র গত চার বছরে। অথচ, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে তথ্য ইন্টারনেট থেকে পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখ যাচ্ছে যে ২০১৪ সালে দেশের বড় ১৯টি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ১১ নম্বরে। অর্থাৎ মমতার মা-মাটি সরকারের সৌজন্যে আমরা পিছনের দিকে এগিয়েছি। তৃণমূলের অভিরূপবাবু নানা পরিসংখ্যান দিয়ে আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন যে উন্নয়নের দৌড়ে আমাদের রাজ্য সবাইকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। এই কাজটা পেশাদারি দক্ষতায় করতেন বাম শাসনে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অসীম দাসগুপ্ত মশাই। অভিরূপ সরকার এখন সেই মহান কর্তব্যটি পালন করছেন। এবং রাজ্যের বর্তমান অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রকে সম্পূর্ণভাবে অন্ধকারে রেখে।

লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সের অর্থনীতির শিক্ষক মৈত্রীশ ঘটক তাঁর সাম্প্রতিক একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, 'পরিসংখ্যানের অনেক বদনাম আছে। একটা কথা আছে, মিথ্যা তিন রকমের হয়। মিথ্যা, ডাহা মিথ্যা আর পরিসংখ্যান। ভাষা ব্যবহার করে যেমন পরম সত্য, চরম মিথ্যা বা বিভ্রান্তিমূলক কথা বলা যায়, সংখ্যা বা পরিসংখ্যান দিয়েও ঠিক তাই করা যায়। তবে পরিসংখ্যানের ভাষা সহজবোদ্ধ নয় বলেই মানুষকে বিভ্রান্ত করাটা অনেক সহজ হয়। মমতা রাজ্যের দায়িত্ব নেওয়ার আগে সমস্ত রাজ্য সরকার প্রত্যেক বছর রাজ্য বাজেটের দিন আর্থিক সমীক্ষা বা ইকনমিক রিভিউ প্রকাশ করতো। মমতার তৃণমূল সরকার রাজ্য বাজেটের সঙ্গে ইকনমিক রিভিউ প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েছে।

সরকারের তথ্য গোপনের অভিপ্রায় না থাকলে প্রকাশ বন্ধ করার অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে না। এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন উন্নয়কে পশ্চিমবঙ্গ ভারতে এক নম্বর। সেটাই সত্য। বাস্তব চিত্রটি যা মিথ্যা। যেমন, মমতা বলেছেন, ফুটপাথে তেলেভাজা চপ বিক্রিও কর্মসংস্থান বা উন্নয়ন। আমি কোনো কাজ না পেয়ে ফুটপাথে চপ আর তেলেভাজা বিক্রি করতে বসলাম— এটা কখনও উন্নয়ন হতে পারে না। বরং একে দারিদ্রায়ণ বলা যেতে পারে। সবিনয়ে স্বীকার করছি যে কথাটা আমার নয়। বলেছেন, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির গবেষক শিক্ষক সুদীপ্ত ভট্টাচার্য। ■

বাঁকুড়া বড় কালীতলা সরস্বতী শিশুমন্দির

শিশুমন্দির কর্মসূচির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ : একটি সমীক্ষা

দেবীপ্রসাদ রায়

বিদ্যাভারতীর অনুমোদিত সরস্বতী শিশুমন্দির রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘে-র বৃহত্তম শিক্ষাপ্রকল্পই শুধু নয় এটি সম্ভবত তার মহত্তম কর্ম প্রয়াস। বৈদেশিক আক্রমণে বৈদেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতের নিজস্ব শিক্ষাদর্শ অনুযায়ী পরিপূর্ণ মানুষ গড়ে তোলার যে প্রয়াস বৈদিককাল থেকে আমাদের জীবনচর্যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তা একটু একটু করে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে আজ অবলুপ্তি সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। বেদবেদান্ত কর্তৃক অমিত পরিমাণ প্রাণশক্তি সঞ্চার করার সামর্থ্যের কারণে ভারতীয় জীবনচর্যা আজও দীর্ঘস্থায়ী প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অনেকাংশে স্তিমিত হলেও বহমান আছে— এ সত্য ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। এর একটা উদাহরণও দেওয়া যেতে পারে। নোবেলজয়ী পদার্থবিদ ফেইনম্যান একবার ত্রিনিদাদ ভ্রমণকালে তাঁর নিগ্রো ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেখানকার ভারতীয়দের সম্পর্কে। নিগ্রো ড্রাইভারটি বলেছিল এদের কারো কারো অবস্থা আমাদের চাইতেও খারাপ কিন্তু 'এদের জীবনযাত্রা প্রণালী ভারী আকর্ষণীয়, ঠিক কেন আমি বলতে পারব না।' ফেইনম্যান বলেছিলেন, 'যে বৈদিক জীবনচর্যা প্রণালী হাজার হাজার বছর ধরে ভারতীয়রা অনুসরণ করে চলেছে তা নানা চমৎকারিত্বে পূর্ণ আর তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বাহিত হচ্ছে।' পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের সময়ে কানে ঢাকা দিয়ে মাটিতে শুয়ে থাকা ফেইনম্যান, ডিরেক্টর ওপেনহাইমারের মুখে গীতার শ্লোক আবৃত্তি শুনে ভারতীয়দের সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে

উঠেছিলেন। তখন পাশ্চাত্য ভোগবাদী জীবনচর্যার চাহিদার কারণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি, জীবনযাত্রার মানের তথাকথিত উন্নয়ন করলেও অনেক নিত্য নতুন জটিল সমস্যার সঙ্গে নৈতিক সঙ্কটেরও জন্ম দিয়েছে। মানুষের স্বাভাবিক যৌক্তিক বিকাশ প্রযুক্তির ঘাতের (impact) সঙ্গে তালমিল রাখতে পারছে না— সুস্থ সুন্দর সামাজিক জীবন ও জীবনবোধ ক্রমশ অলভ্য হয়ে পড়ছে। অবাঞ্ছিত এই ভবিষ্যতের কথা ভেবেই ভারতীয় পরম্পরাগত সুস্থ সুন্দর স্থিতিশীল সমাজ জীবনের জন্যই এক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলায় বিষ্ণুপুরাণ থেকে আহরিত শিক্ষাদর্শ 'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে' অবলম্বন করে শিশুমন্দির শিক্ষা ধারার প্রবর্তন করে 'বিদ্যাভারতী'। ১৯৫২ সালে গোরক্ষপুর কৃষ্ণচন্দ্র গান্ধীর পরিচালনায় প্রথম সরস্বতী শিশুমন্দির স্থাপিত হয়।

ক্রমবর্ধমান এই সাফল্যের কারণ পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যে বিভ্রান্ত হয়ে পাশ্চাত্যাভিমুখী জীবনচর্যার প্রতি যতই আকৃষ্ট হোক না কেন অন্তরে অন্তরে ভারতীয় পরম্পরার জীবনবোধের জন্য আকুতি একটা আছেই দেশবাসীর মধ্যে এবং সে আকুতি মহত্তর লক্ষ্যের জন্য, অমৃতত্ত্ব লাভের জন্য, তার পথ পাশ্চাত্য ভোগবাদী পথ নয়— অন্তরে লুকিয়ে আছে সেই উপলব্ধি 'অবিদ্যাপ মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া মৃত্মশ্নুতে' ---ঈশোপনিষদ। মরজগতের প্রতিকূলতাকে অবিদ্যা বা অপরা বিদ্যা বা বিজ্ঞান দ্বারা জয় করে বিদ্যা (পরা) দ্বারা অমৃতত্ত্ব অর্জন করতে হবে এবং তারই চালিকা দর্শন হলো 'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে'।। (বিষ্ণুপুরাণ)

এই চালিকাদর্শন অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে শিশুমন্দির পরিচালনার ক্ষেত্রে। দু' একটি ঘটনা সামান্য হলেও অসামান্য তাৎপর্যপূর্ণ এবং উল্লেখনীয়। শিশুমন্দিরে শেখানো সদাচার, শিশু তার বাড়িতে প্রয়োগ করার জিদে এবং আবদারে বিচ্ছিন্ন বাবা মা ও ছেলের পরিবারকে এক করে দিয়েছে। শিশুর দাদু শিশুমন্দিরকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেছেন। শিশুমন্দিরেরর শিশু অসুখের সময় মন্দিরের দিদিভাই (আচার্যা)-এর কথা বলছে— সান্নিধ্য চাইছে, বাড়িতে বাবা মার কাছে থেকেও। মুসলমান পিতা শিশুমন্দিরের দৈনিক কার্যক্রমে মুগ্ধ হয়ে সব বাধা অগ্রাহ্য করে তার মেয়েকে শিশুমন্দিরে ভর্তি করতে আসছেন।

শিশুমন্দির 'হিন্দুত্ব' প্রচারের সংস্থা— এই বলে বাড়ি বাড়ি ঘুরে শিশুমন্দিরে শিশুদের ভর্তি না করার আবেদন জানিয়েছে বিশিষ্ট রাজনৈতিক মানুষেরা— শেষে দেখা গেল তারাই লাইন দিয়ে আসছে তাদের শিশুদের সরস্বতী শিশুমন্দিরে ভর্তির আবেদন নিয়ে। শিশুদের দিয়ে তাদের কাছে দুর্বোধ্য গায়ত্রীমন্ত্র

অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থা বিদ্যাভারতীর কাজের সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান

বিদ্যালয়		
প্রাথমিক (শিশু থেকে পঞ্চম)	—	৪৬৮৩
পূর্ব মাধ্যমিক (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম)	—	৪৫৬৪
মাধ্যমিক (নবম ও দশম)	—	২২৩৯
উচ্চমাধ্যমিক (একাদশ ও দ্বাদশ)	—	৮৭৭
	মোট	১২৩৬৩

গতিবিধি		
সংস্কার কেন্দ্র	—	৪১৭৩
একল বিদ্যালয়	—	৭৮২৮
	মোট	১২০০১

ছাত্রছাত্রী সংখ্যা	ভাই	বোন	মোট
বিদ্যালয়	১৯৪২৭৫০	১২৬৩৪৬২	৩২০৬২১২
সংস্কার কেন্দ্র	৫৬৬১১	৪০৬৯২	৯৭৩০৩
একল বিদ্যালয়	৮৭০২৬	৬১০৭৪	১৪৮১০০
মোট	২০৮৬৩৮৭	১৩৬৫২২৪	৩৪৫১৬১৫

আচার্য	পুরুষ	মহিলা	মোট
বিদ্যালয়	৭১৯৩৪	৬৩৫৬৬	১৩৫৫০০
সংস্কার কেন্দ্র	২২৮০	১৬০৪	৩৮৮৪
একল বিদ্যালয়	৪৪৪০	২৮১৯	৭২৫৯
মোট	৭৮৬৫৪	৬৭৯৮৯	১৪৬৬৪৩

কার্যকর্তা	পুরুষ	মহিলা	মোট
পূর্ণকালিক	৬০৮	১২	৬২০
প্রচারক	৫৫	—	৫৫

ভূ র্ভূব স্ব... আবৃত্তি করছেন কেন? বলেছি রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'তে এর উত্তর আছে। এছাড়াও ভূ (পৃথিবী) ভুব (অন্তরীক্ষ) এবং স্ব (সূর্য) প্রাণধারণের জন্য এই পরিমণ্ডলকে পবিত্র, দূষণমুক্ত রাখতে হবে— তাই গায়ত্রীমন্ত্র ছোটবেলা থেকেই শিশুদের ভাবনাচিন্তা বিকাশের সঙ্গে জড়িত থাক— এটিই এই মন্ত্র রচয়িতাদের উদ্দেশ্য ছিল, আধুনিক বিজ্ঞান কি এই নিয়ে নয়? এই উত্তরে সব বিরোধিতা স্তব্ধ হয়েছে। শিশুমন্দিরের

অগ্রগতি এভাবেই হয়ে এসেছে— সরকারি অর্থ সাহায্য ব্যতিরেকে, অনেক প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতার মাঝখানে। কিন্তু এই শিশুমন্দির প্রকল্প আজ অনেক সমস্যারও সম্মুখীন এবং বিশেষ করে এই রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে— ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলির দাপটে ও আপাত চাকচিক্যের আকর্ষণে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে উদ্ভূত ইংরেজিভাষার গ্রহণীয়তা অনস্বীকার্য— তদনুযায়ী ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ইংরেজিকে গুরুত্ব দেওয়াই যায় এবং তারই স্বার্থে ইংরাজী মাধ্যমও মানা যায়, কিন্তু ইংরাজীকে মাধ্যম করার আড়ালে পাশ্চাত্য তথা খৃষ্টান সংস্কৃতিকে আগ্রাসী হয়ে উঠতে দেওয়া যায় না কোনোমতেই। আমাদের ভারতীয় বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত এবং বিদেশিদের দ্বারাও প্রশংসিত পারিবারিক বন্ধন ভেঙে যাচ্ছে দ্রুত এবং ভারতীয় পরিবারের তথা সমাজের পাশ্চাত্যায়ণ ঘটে চলেছে দ্রুত— এটা কাম্য নয়। কারণ যে নৈতিক সঙ্কটকে ত্বরান্বিত করছে এই পাশ্চাত্যায়ণ-প্রবণতা, ভারতীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন সুস্থ সুন্দর স্থিতিশীল সমাজ ধারণাকে বিপর্যস্ত করছে যে প্রবণতা তাতে ভেসে গেলে সুস্থ সুন্দর জীবনবোধ যার জন্য সমগ্র বিশ্ব আজ ভারতকে সামনে রেখে তৃষিত হয়ে আছে তা ক্রমশ দূরে চলে যাবে।

এই প্রবণতাকে রুখতে হলে বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যার জন্য সরকারি আনুকূল্য চাই।

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সব শিশুমন্দিরই চতুর্থশ্রেণী অবধি। তারপরই ছাত্রছাত্রীরা অন্য স্কুলে যেতে বাধ্য হয় যেখানে তারা শিশুমন্দিরের আবহাওয়া না পেয়ে অত্যন্ত অসুবিধা বোধ করে, অভিভাবকরাও চরম অতৃপ্তি ও অশান্তিতে ভোগেন। তাদের

সেবা প্রকল্প	—	৩০
ন্যাস (ট্রাস্ট)	—	২২
গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যালয়	—	৭৪৬৭
শহর এলাকায় বিদ্যালয়	—	৪১৫৮
বনবাসী এলাকায় বিদ্যালয়	—	৪৪৭
অবহেলিত মহল্লায় বিদ্যালয়	—	২৯১
মোট	—	১২৩৬৩

সনির্বন্ধ অনুরোধ ও আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও পঞ্চম ও উচ্চতর শ্রেণী খোলা যাচ্ছে না। কোথাও পঞ্চম শ্রেণী খোলা হচ্ছে স্থানীয় সহযোগিতায়। তখন আবার এগুলির অনুমোদন প্রাপ্তি নিয়ে সংশয় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এখানে ঝুঁকি নিয়ে ভর্তি করার পর মাধ্যমিক অবধি পর পর উচ্চ শ্রেণীগুলি অনুমোদন পাবে কিনা অভিভাবকরা নিশ্চিত হতে পারছেন না এবং সেই কারণেও পঞ্চম শ্রেণী খুলে অত্যন্ত দুশ্চিন্তার মধ্যে পরিচালকদের কাটাতে হচ্ছে। আর্থিক ও শিক্ষক সমস্যাটা অনতিক্রম্য নয় কিন্তু অনুমোদনের নিশ্চয়তা প্রদান করা কঠিন। এ সবের সমাধান হবে যদি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ভাবা যায় :

(১) অবিলম্বে সর্বভারতীয় 'বিদ্যাভারতী বোর্ড' গঠন ও চালু করতেই হবে। এই বোর্ড গঠন ঘোষিত হলেই অন্তত শিশুমন্দিরের অভিভাবকরা তাদের ছেলেমেয়েদের ভর্তি করবেই— আমরা যা বুঝেছি, ব্যয়বহুল এবং ভারতীয় পরম্পরা বিচ্ছিন্ন ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনেকেই নারাজ। 'বিদ্যাভারতী' তাদের আদর্শকে ব্যাহত না করে তদনুযায়ী নিজস্ব ইংরেজি পাঠক্রমের ব্যবস্থা করবে। তা হলেই সমস্যা মিটবে। শিশুমন্দির ধারার অগ্রগতি নিশ্চিত হবে।

(২) সরস্বতী শিশুমন্দির প্রবর্তিত 'অভিভাবক সম্পর্ক' এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। শুধুমাত্র ছাত্র পঠন-পাঠন বিষয়ের উন্নতির ভাবনা ছাড়িয়ে এই অভিভাবক সম্পর্ককে ভারতীয় শিক্ষাদর্শের প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে, অভিভাবকদের প্রণোদিত করতে হবে ভারতীয় আদর্শ প্রচারের প্রয়োজনে নিজেদেরই মধ্যে পাঠচক্র/ আলোচনা চক্রের এক চলমান শৃঙ্খলা তৈরি করতে। এগুলিকে সজীব ও প্রাণবন্ত ও সৃজনধর্মী রাখতে সম্পূর্ণভাবে অবহিত প্রচারক চাই যারা সম্ভাব্য সব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারবে।

(৩) এইসব সদর্থক ধারণার উৎস হিসেবে সঙ্ঘকে এই ধরনের প্রচারক তৈরিতে বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হতে হবে। সঙ্ঘের নিজস্ব গঠন শৈলী আছে তবুও অতিরিক্ত বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে— ঔদার্যের সঙ্গে সঙ্ঘবৃত্তের বাইরে গিয়েও সমমতাদর্শের নিবেদিত প্রাণ মানুষকে আনার সংস্থান করতে হবে। তবেই ব্যাপকভাবে শিশুমন্দির শিক্ষা ধারা প্রসারিত হবে।

একাজ যাঁরা শুরু করেছিলেন তাঁদের নিষ্ঠা, ঔদার্য-অহংবোধ শূন্যতা এখনো অবধি বাহিত হচ্ছে কিনা উত্তরসূরিদের দ্বারা তার পুর্নসমীক্ষণ প্রয়োজন। তবেই প্রার্থিত ভারতীয় সমাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। শিশুমন্দিরের বিকাশ শুধু সংখ্যাগত নয়, গুণগত ও আদর্শগত হওয়াটাই প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল এ কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে।

(লেখক বাঁকুড়া খৃষ্টান কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক এবং সরস্বতী শিশুমন্দির বড়কালীতলা, বাঁকুড়ার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যাভারতীর অগ্রগতি

বিজয়গণেশ কুলকার্ণী

বিগত চার দশকের অখণ্ড সাধনায় পশ্চিমবঙ্গে বেসরকারি শিক্ষা ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদ একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৭৪ সালে শিলিগুড়িতে সরস্বতী শিশু মন্দির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এর শুভ সূচনা হয়। ক্রমশ পশ্চিমবাংলার প্রতিটি জেলায় শিশু মন্দিরের মালিকা তৈরি হয়। বর্তমানে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গ মিলিয়ে ৩৫০টি শিশু মন্দির ও মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যামন্দিরগুলি সুনামের সঙ্গে কাজ করে চলেছে।

স্বাধীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পশ্চিমী প্রভাব মুক্ত করে জাতীয় ভাবধারায় প্রবাহিত করার একটি প্রয়াস ১৯৫২ সালে উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরে সরস্বতী শিশু মন্দির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আরম্ভ হয়েছিল। এই শিক্ষার সঙ্গে সংস্কার দ্বারা প্রকৃত মানুষ গড়ার প্রয়াসকে জনসাধারণের অকুণ্ঠ সহযোগিতার ফলে ১৯৭৮ সালে এই সংগঠন দেশের সব প্রদেশে ব্যাপ্ত হয়। ফলে একটি সর্বভারতীয় সংগঠনের প্রয়োজন অনুভব করে 'বিদ্যাভারতী অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থান' গড়ে তোলা হয়। বর্তমানে ভারতের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে 'বিদ্যাভারতী' একটি সুপরিচিত নাম। কচ্ছ থেকে কামরূপ ও লাদাখ থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত এর শাখা-প্রশাখা প্রসারিত হয়ে বিশাল বটবৃক্ষের রূপ ধারণ করেছে। পূর্ব প্রাথমিক থেকে উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে ১৩২০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১২০০০ নিঃশুল্ক অনৌপচারিক 'সংস্কার কেন্দ্র' বিদ্যাভারতীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্য রয়েছে ১৫৬টি সিবিএসসি-র সঙ্গে সংযুক্ত বিদ্যালয়। এই বিশাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেড় লক্ষ সেবাপরায়ণ ও সমর্পিত আচার্য- আচার্যা ৩৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা ও সংস্কার প্রদানের পবিত্র কাজে ব্রতী রয়েছেন। ফলে ভারতে সর্ববৃহৎ বেসরকারি কিন্তু প্রভাবশালী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যাভারতী সুনাম অর্জন করেছে।

শিক্ষার মাধ্যমে দেশপ্রেম ও সামাজিক চেতনা জাগানোর বিদ্যাভারতীর এই অভিনব অভিযানে পশ্চিমবঙ্গও পিছিয়ে নেই। ১৯৯৫ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত বিদ্যালয় পরিচালনা করা হোত। প্রাথমিকের গণ্ডী পেরিয়ে মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যালয়কে উন্নীত করা ছিল একটি দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু রায়গঞ্জে সর্বপ্রথম সিবিএসই অনুমোদিত 'সারদা বিদ্যা মন্দির' স্থানীয় অভিভাবকদের একান্ত আগ্রহে আরম্ভ করা হলো। এর জন্য সঙ্ঘের চতুর্থ সরসঙ্ঘচালক স্বর্গীয় অধ্যাপক রাজেন্দ্র সিংহ (রজ্জু ভাইয়া)-র প্রেরণা ছিল। পরে শিলিগুড়িতে বিমলকৃষ্ণ দাশের বিশেষ প্রচেষ্টায় বাংলা মাধ্যমে মাধ্যমিক বিদ্যালয় আরম্ভ হলো। বর্তমানে ১৬টি স্থানে মাধ্যমিক বিদ্যালয় আরম্ভ হয়েছে। এটি একটি শুভ সঙ্কেত বলা যায়।

বিদ্যাভারতীর লক্ষ্য ও কর্ম পদ্ধতিকে যথাযথভাবে অনুসরণ করে পশ্চিমবঙ্গে এক অভিনব জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন হয়েছে। প্রাক্ প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে বিদ্যাভারতীর 'শিশু বাটিকা' অর্থাৎ অনৌপচারিক শিক্ষা পদ্ধতি অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শিশুদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে অভিভাবকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে সময়ে সময়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। পরিষদের পক্ষ থেকে আচার্য- আচার্যাদের দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে ৭ দিন, ১৫ দিনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিয়মিতভাবে চলছে। তাছাড়া শারীরিক, সঙ্গীত, সংস্কৃত, যোগ ও নৈতিক শিক্ষা ও শিশুবাটিকা বিষয়ে আচার্যাদের প্রতিবর্ষ প্রশিক্ষণ হয়ে থাকে। ছাত্রদের জন্য মেধা পরীক্ষা, বৈদিক গণিত, সংস্কৃতি জ্ঞান পরীক্ষা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপ বিদ্যালয়, জেলা, প্রদেশ থেকে সর্বভারতীয় স্তর পর্যন্ত হয়ে থাকে। বাংলার ছাত্র-ছাত্রীরা সর্বভারতীয় বিজ্ঞানমেলা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতাতেও কৃতিত্ব প্রদর্শন করে থাকেন। ছাত্র-ছাত্রী ও আচার্যদের প্রতিভা বিকাশের উদ্দেশে প্রতিবছর অর্চনা ও অর্জন পত্রিকা ও বিদ্যাভারতী সংবাদ নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করা হয়।

বাংলায় বিদ্যাভারতীর যে অব্যাহত অগ্রগতি চলছে তার পৃষ্ঠভূমিকায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অধিকারীবৃন্দ ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ স্বর্গীয় অমলকুমার বসু পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সভাপতি হিসাবে দীর্ঘকাল পথনির্দেশ করেন। পরিষদের সংগঠন সম্পাদক হিসাবে আমি ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত কাজ করেছিলাম। পরবর্তীতে বাংলার প্রবীণ প্রচারক প্রয়াত সত্যব্রত সিংহ ১২ বৎসর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যাভারতীর কাজের দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন করে গেলেন। বি.বি. পরিষদের আরম্ভকাল থেকে বাংলার প্রথম শিশু মন্দিরের প্রধানাচার্য বিমলকৃষ্ণ দাস ও হাওড়ায় শিশু মন্দিরের প্রধানাচার্যা শ্রীমতী ঋতা চক্রবর্তী শৈক্ষিক ব্যবস্থার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন ও এখনও করে যাচ্ছেন। সংগঠনের বিস্তার ও বিকাশে দেবাংশু কুমার পতি পূর্ণকালিক কার্যকর্তা হিসাবে হাওড়ায় আসেন। পরে অনেক শিশু মন্দিরের প্রধানাচার্য পূর্ণকালিক হিসাবে এগিয়ে এলেন। তন্মধ্যে তারকদাস সরকার সঙ্ঘের প্রচারক হয়ে বর্তমানে দক্ষিণবঙ্গের সংগঠন সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। এটি পরিষদের জন্য একটি বড় প্রাপ্য বলা যায়।

বাংলার শিক্ষা সচেতন ও সংস্কৃতিনিষ্ঠ মানুষ বিদ্যাভারতীর কাজকে আপন করে নিয়েছেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁরা শিশু মন্দিরে নিজের ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করিয়ে তাঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে আশ্বস্ত হতে পারছেন এটি আমাদের অভিজ্ঞতা। আগামীদিনে বিদ্যাভারতীর এই জয়যাত্রা ৫০০ শিশু মন্দির ও ৫০টি বিদ্যালয়মন্দির (হাই স্কুল) প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নিয়ে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাবে এই বিশ্বাস করি। এখানে অত্যন্ত

উৎসাহ ও আশার কথা হলো যে বিদ্যাভারতীর কেন্দ্রীয় অধিকারীদের বিশেষ প্রচেষ্টায় কলকাতার শিক্ষাপ্রেমী ও সামর্থ্যবান্ ব্যক্তিবিশেষ ও প্রতিষ্ঠানগুলি বাংলার বিদ্যালয়গুলিকে বিভিন্ন প্রকার সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন। মহান্ উদ্দেশ্য নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করেও সাধনের অভাবে কাজের অগ্রগতি অবরুদ্ধ হয়। এই সময় সদাশয় ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠান সহায়তার হাত বাড়ালে নিশ্চিতভাবে উৎসাহবর্ধন হবে।

শেষে বলতে চাই যে স্বামী বিবেকানন্দের নামে গঠিত এই প্রতিষ্ঠান তাঁরই আশীর্বাদে ও প্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা জগতে একটি আলোকবর্তিকারূপে কাজ করবে যা সকলেরই একান্ত কাম্য।

(লেখক বিদ্যাভারতীর সংস্কৃতি শিক্ষা সংস্থান কুরুক্ষেত্রের সহসচিব ও পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যাভারতীর প্রাক্তন সংগঠন সম্পাদক)

উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের শিশুমন্দিরের পরিসংখ্যান

জেলা	বিদ্যালয় সংখ্যা	ছাত্রছাত্রী			শিক্ষক		
		ভাই	বোন	মোট	আচার্য	আচার্যা	মোট
কোচবিহার	২৯	৫০৮৪	৩৮৯১	৮৯৭৫	২৩৪	১৫১	৩৮৫
আলিপুরদুয়ার	৯	৭৮১	৬৬৩	১৪৪৪	৪২	৩৬	৭৮
জলপাইগুড়ি	১৫	৩০৪১	২৫৩১	৫৫৭২	১১৩	১৩১	২৪৪
দার্জিলিং	৬	৬৯৯	৬৪৪	১৩৪৩	২২	৪০	৬২
দক্ষিণ দিনাজপুর	১৫	১৯৮২	১৬৪১	৩৬২৩	৭৩	৭১	১৪৪
উত্তর দিনাজপুর	১৭	৩৯৪৩	২৮৬৩	৬৮০৬	১৫৮	১০৮	২৬৬
মালদা	১৪	১৮৪৯	১৪৮২	৩৩৩১	৮৭	৭২	১৫৯
মুর্শিদাবাদ	২০	৩১৯০	২৪৮১	৫৬৭১	১২৪	১০০	২২৪
বীরভূম	২০	১৮২১	১৩৬৬	৩১৮৭	৯৬	৮১	১৭৭
নদীয়া	৬	৮৯০	৭২১	১৬১১	৩৪	৩৭	৭১
বর্ধমান	১২	১০৫৬	৯২০	১৯৭৬	৪০	৭২	৭১
হুগলী	১০	৯৮৬	৭৪৩	১৭২৯	৪৪	৫২	৯৬
কলকাতা	৬	৩৭৭	৩৯০	৭৬৭	১১	৪১	৫২
উত্তর ২৪ পরগনা	৩	৫৩৪	৩৫৫	৮৮৯	২৪	১৭	৪১
দক্ষিণ ২৪ পরগনা	৬	৩০৪	২১৫	৫১৯	৬	২৯	৩৫
হাওড়া	৮	১২১১	১০০৫	২২১৬	৩২	৭৭	১০৯
পশ্চিম মেদিনীপুর	৫৪	৪৩৯৭	২৭০৪	৭১০১	১৬১	৩০৬	৪৬৭
পূর্ব মেদিনীপুর	১৫	৮৫৮	৫৪৪	১৪০২	২২	৭৩	৯৫
বাঁকুড়া	৩১	৩৫৮২	২৩২৯	৫৯১১	১৩৭	১৪৩	২৮০
পুরুলিয়া	১৩	১৩৩৮	৬৭৯	২০১৭	৭৭	১৯	৯৬
সর্বমোট	**৩০৯**	**৩৭৯২৩**	**২৮১৬৭**	**৬৬০৯০**	**১৫৩৭**	**১০৫৬**	**৩১৯৩**

পশ্চিমবঙ্গে শিশুমন্দির

বিমল কৃষ্ণ দাস

স্থানীয় সঙ্ঘ-কার্যকর্তাদের অদম্য আগ্রহ ও নিপুণ পরিকল্পনায় ১৯৭৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ভারতের পূর্বক্ষেত্রের অর্থাৎ ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, অসম থেকে ত্রিপুরা পর্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যাভারতীর প্রথম শিশুমন্দির শুরু হয় শিলিগুড়িতে। অবশ্য 'শিশুমন্দির' নামে নয়। নাম হয়েছিল 'সারদা শিশুতীর্থ', কারণ দেশের জরুরি অবস্থায় স্থানে স্থানে শিশুমন্দিরগুলিকে সরকারি অধিকারে নিয়ে আসা, প্রকৃতপক্ষে তখন 'বিদ্যাভারতীও' ছিল না। 'বিদ্যাভারতী' রূপলাভ করে ১৯৭৭-এ জরুরি অবস্থার অবসানে দিল্লীতে আয়োজিত সমগ্র দেশের তৎকালীন শিশুমন্দিরগুলির ১৬ হাজার শিশু শিবির অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। শিলিগুড়িতে 'সরস্বতী শিশুমন্দির' নামে 'লেটারপ্যাড', রসিদ বই প্রচারপত্র ইত্যাদি ছাপা হলেও জরুরি অবস্থায় প্রশাসনের বক্রদৃষ্টির কারণে 'সারদা শিশুতীর্থ' নামের অবতারণা। কিন্তু ফল হলো না। ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫ সালে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন বিদ্যালয় 'সিল' করে দিল। মাত্র ২৪ জন শিশু, সর্বাধিক বয়স ৬ বছর। তাদের নিয়ে এখানে নাকি দেশবিরোধী কাজ চলছিল। বিদ্যালয় পুনরায় শুরুর সুযোগ হয় জরুরি অবস্থার অবসানে। ১৯৭৮ থেকে শুরু হয় শিশুতীর্থের নবোদ্যমে পথ চলা। '৮০ সাল থেকে আচার্য আচার্যাদের ঘরোয়া প্রশিক্ষণ দানের কাজ শুরু হয়। দ্বিতীয় বিদ্যালয় শুরু হয় নবদ্বীপে। তারপর কুচবিহার, পুরুলিয়া, বর্ধমান, মালদহ ইত্যাদি। শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা এবং ভারতীয় সংস্কৃতি কেন্দ্রিক— এ সমস্ত কিছুই ছিল অভিভাবকদের আকর্ষণ কেন্দ্র বিন্দু। বিদ্যালয়ের কার্যকর্তা ও আচার্যবৃন্দের শিশুতীর্থের উদ্দেশ্য রূপায়ণে শুদ্ধ অন্তরের যে নিরলস প্রয়াস, নিষ্ঠা তা সমাজের মধ্যে সর্বত্র খুব সহজে আসন করে নেয়। তৈরি হয় প্রদেশ সমিতি 'বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদ' (১৯৮২)। পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক আকারের কারণে বছর দশেক আগে বিদ্যাভারতীর দিক থেকে দুটি প্রদেশ করা হয়। দক্ষিণবঙ্গে 'বি.বি. পরিষদ'-ও উত্তরে 'বিদ্যাভারতী উত্তরবঙ্গ'। বর্তমানে বি.বি. পরিষদ অন্তর্গত শিশুমন্দির চলছে ২০৩টি— ছাত্রছাত্রী ৩৭০০০ এবং আচার্য আচার্যা ১৯০০-র মতো। উত্তরবঙ্গে প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয় চলছে ৯২টি; মাধ্যমিক স্তরে ১৪টি। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত প্রথম বিদ্যালয় সারদা বিদ্যামন্দির, পুঁটিমারী (শিলিগুড়ি)। ইতিমধ্যে রায়গঞ্জে ইংরেজি মাধ্যমে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে সি বি এস ই অনুমোদিত বিদ্যালয় শুরু হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে ৬টি উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বিদ্যালয় চলছে। আজ বিদ্যাভারতীর কাজ দুই বঙ্গেই প্রসার লাভ করেছে। তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় ও সময়ের হিসেবে নগণ্য। দু'বঙ্গে মিলিতভাবে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশন ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। দু' প্রদেশেই হয় প্রদেশ স্তরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞান মেলা, বিভিন্ন স্তরে আচার্য প্রশিক্ষণ, হয়েছে সাংস্কৃতিক শিশুমেলা। ২০১৫-তে উত্তরবঙ্গে সঙ্গীত বিভাগের পক্ষ থেকে হলো প্রাদেশিক সঙ্গীত প্রতিযোগিতা। অভিভাবক, অভিভাবিকা, শুভানুধ্যায়ী, সমিতি, ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে হয় এমন নানা অনুষ্ঠান, ১৯৭৫-এর পর বর্তমান সময় পর্যন্ত এসেছে বহু পরিবর্তন। সময়ানুসারে অনেক নিষ্ঠাবান আচার্য, আচার্যা, কর্মকর্তা প্রয়োজন, তার কথা আজ ভাবা দরকার। পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে অপরিবর্তনীয় সত্য-কে স্থির রাখা প্রয়োজন। তার জন্য চাই উপযুক্ত পরিকল্পনা ও ক্রিয়ান্বয়ন।

(লেখক বাংলার শিশুমন্দির-এর অন্যতম পুরোধা)

পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে বিদ্যাভারতী

দেবাংশু কুমার পতি

এ জগতে কোনো বড় ঘটনা একদিনে হঠাৎ ঘটেনি। লোকচক্ষুর আড়ালে গড়ে ওঠা শুরু হয়। কালক্রমে তার প্রকাশ সকলের চোখে পড়ে। বীজ হতে যখন ছোটো চারাগাছ সৃষ্টি হয় তখন তা অনেকেরই নজর এড়িয়ে যায়। যেদিন সে বৃক্ষরূপে মাথা তুলে দাঁড়ায় তখন তার জন্মকথা জানার কৌতূহল হয়। শুরু হয় ইতিহাসের খোঁজ। বিদ্যাভারতীরূপী বটবৃক্ষের শিক্ষাধারার প্রভাব ধীরে ধীরে ভারতে ছড়াতে থাকলেও তা তখনও পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেনি। এখানে সরস্বতী শিশুমন্দির যোজনার শুভারম্ভ ১৯৭৫ সালে শিলিগুড়ি শহরের মিলনপল্লী স্থিত ভাড়া বাড়িতে হয়। শিশুমন্দির শুরুর পরে পরে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা হয়। জরুরি অবস্থার কারণে ওই বছরই শিশুমন্দির বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে ১৯৭৮ সালে ওই স্থানেই সারদা শিশুতীর্থ নামে নতুন ভাবে আবার পথ চলা শুরু হয়। পরে ধীরে ধীরে শিশুমন্দির পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। কার্যকর্তাগণ প্রদেশ সমিতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাই ওই সময় প্রান্ত কার্যকর্তাদের উদ্যোগে কালিদাস বসুর নেতৃত্বে ১৯৮২ সালে বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ নামে একটি প্রাদেশিক সমিতি গঠন করা হয়। ওই বছরই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সোসাইটি অ্যাক্ট অনুসারে রেজিস্ট্রি ভুক্ত করা হয়। পরে ধীরে ধীরে শিশু মন্দিরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং কাজের সুবিধার জন্য ২০০৫—২০০৬ শিক্ষাবর্ষে বিদ্যাভারতী উত্তরবঙ্গ নামে উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলাকে নিয়ে একটি আলাদা সমিতি (বর্তমানে ৭টি জেলা) এবং অবশিষ্ট ১৩টি জেলাকে নিয়ে বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদ দক্ষিণবঙ্গে কাজ করবে বলে স্থির হয়।

শিলিগুড়ি সেবক রোড সারদা শিশুতীর্থের ভাই-বোন ও আচার্য-আচার্যা।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেলপাহাড়ীর কাছে প্রত্যন্ত গ্রাম ও পাহাড় দিয়ে ঘেরা কাঁকড়াঝোড় গ্রামে গত ২০০৩ সালে বনবাসীদের নিয়ে একটি নিঃশুল্ক সংস্কার কেন্দ্র সিধু-কানহু-বীরসা সরস্বতী সংস্কার কেন্দ্র নামে শুরু হয়। তাদের মধ্যে শিক্ষা, সংস্কার ও স্বাভিমান জাগানোর কাজ ধীরে ধীরে চলতে থাকে। ফলস্বরূপ সেখানে সংস্কার কেন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে শিশুমন্দির শুরু করতে আমরা বাধ্য হই। মেদিনীপুর শহরের সিপাইবাজার স্থিত শিশু মন্দিরের অভিভাবকগণ সেই সংস্কার কেন্দ্র ও শিশু মন্দিরটিকে দত্তক নেন। ফলে ওই এলাকার শিশুদের জন্য বই-খাতা, জামা-কাপড়, বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য অর্থ, আচার্য-আচার্যাদের সম্মানদক্ষিণার জন্য অর্থ প্রয়োজন অনুসারে তাঁরাই দিয়ে থাকেন। বর্তমানে সেখানের শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা আচার্য- আচার্যারূপে এগিয়ে এসেছেন। স্থানীয় ছেলে-মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিশুদের সংস্কারের ফলে অভিভাবকদের মধ্যেও বদনেশা করার প্রবণতা কম হয়েছে। এছাড়া বাঁকুড়া জেলার ঝিলিমিলি, পুরুলিয়া জেলার বাগমুণ্ডী, আড়ষা ও অন্যান্য জেলার প্রত্যন্ত বনবাসী গ্রামে শিশু মন্দিরের মাধ্যমে শিক্ষা ও সংস্কারের কাজ চলছে।

২০০৪ সালে রাঁচী শহরে বিদ্যাভারতীর যোজনায় শিশুমন্দিরের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে অখিল ভারতীয় বনবাসী বালসঙ্গম আয়োজিত হয়। তাতে আমাদের প্রদেশ থেকে প্রায় ১০০ জন ভাই-বোন অংশগ্রহণ করে। সেখানে বিবিধ কার্যক্রমের মধ্যে প্রতিযোগিতাও রাখা হয়েছিল। তার মধ্যে তিরন্দাজী প্রতিযোগিতায় কাঁকড়াঝোড় শিশু মন্দিরের ভাই রঞ্জিত মুণ্ডা প্রথম স্থান এবং পুরুলিয়ার বুড়দা বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরের ভাইয়েরা লোকনৃত্য প্রতিযোগিতায় ছৌ-নৃত্য পরিবেশন করে প্রথম স্থান অধিকার করে।

পশ্চিম মেদিনীপুরের রাধামোহনপুর, বিবেকানন্দ শিশু মন্দির, নতুন শিশুমন্দির ভবন করতে গেলে স্থানীয় কমিউনিস্ট নেতাদের বাধার মুখে পড়তে হয়। তারা সমিতির সদস্য এবং অভিভাবক-অভিভাবিকাদের ভীতি প্রদর্শন ও ছাত্র-ছাত্রীদের সেখানে ভর্তি করতে বারণ

করতে থাকে। এছাড়াও প্রচার করতে থাকে আর এস এস এই বিদ্যালয়ে শিশুদের সন্ত্রাসমূলক শিক্ষা দিয়ে এলাকায় গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করবে। এরূপ পরিস্থিতিতে সমিতির সম্পাদক সিপিএমের জেলা সম্পাদকের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, মেদিনীপুর শহরে যদি পার্টির নেতাদের ছেলেরা পড়তে পারে তবে এখানে পারবে না কেন? আর সেখানে শিশুমন্দির যদি চলতে পারে তবে এখানে চলবে না কেন? এতে পার্টির নেতারা পিছিয়ে যায় এবং শিশুমন্দির থেকে পরিষদের অনুমোদিত বিদ্যালয় হিসাবে কাগজ পত্র দেখিয়ে থানায় জানানো হলে, থানা থেকে পুলিশ এসে শিশু মন্দিরের পক্ষে রায় দেয় এবং ভবনের কাজ ও শিশুমন্দিরের পাঠদান সুষ্ঠুভাবে শুরু হয়।

১৯৯৬ সালে সারা দেশব্যাপী স্বদেশি বস্তু ব্যবহারের জন্য আহ্বান জানালে শিশুমন্দিরগুলি একাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শিশুমন্দিরের আচার্য- আচার্যারা এলাকায় বিভিন্ন বাড়িতে বাড়িতে এর ব্যাপক প্রচার শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের কাছে স্বদেশি বস্তু ব্যবহার কেন করব এবং কোনগুলি স্বদেশি ও বিদেশি বস্তু তার কথা তাদের বলা হতে থাকে। তাদের বাড়িতেও এর একটি তালিকা পাঠানো হয়। ব্যাপক প্রচারের ফলে বাড়িতে বাড়িতে কলগেট টুথপেস্ট-এর পরিবর্তে বাবুল ব্যবহার শুরু হয় এবং এরূপ অনেক স্বদেশি জিনিসই ব্যবহার হতে থাকে। অভিভাবকেরা এসে বলতে থাকেন আমাদের কথা শিশুরা না শুনে আপনাদের কথা শুনছে। তারা বাড়িতে স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহার করতে আমাদের বাধ্য করছে।

রাখিবন্ধন উৎসব শিশু মন্দিরের একটি বিশেষ উৎসব। এই দিনটি সাধারণ মানুষের সঙ্গে সঙ্গে জেলাশাসক, মহকুমা শাসক, জেলা জজ, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন জন শিশুদের হাত থেকে রাখি পরার জন্য অধীর আগ্রহে এ দিনটির দিকে তাকিয়ে থাকেন। আবার কিছু মানুষ আছেন যারা বিভিন্ন কারণে তা পরতে অনাগ্রাহী। গত ১৯৯৯ সালে দমদম শিশু মন্দিরের ছাত্র-ছাত্রীরা চার তলার একটি ফ্ল্যাটে রাখি নিয়ে উপস্থিত হয়ে দেখে বাড়িতে প্রায় ৮০/৮৫ বছরের এক বৃদ্ধকে। তাকে দেখেই শিশুরা রাখি পরিয়ে প্রণাম করতেই তার চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ে। তিনি বলেন আমাকে জীবনে কেউ কখনও রাখি পরায়নি। এই প্রথম জীবনের শেষ সময়ে আমার হাতে কেউ রাখি পরিয়ে দিল। তিনি শিশুদের আশীর্বাদ করেন।

বাঁকুড়া শহরের প্রণবানন্দ পল্লী এলাকায় একটি শিশুমন্দির করার প্রয়োজন ছিল। সেখানকার এক কার্যকর্তা কিরণ শঙ্কর চৌধুরী প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। ওই সময় বিষ্ণুপদ লায়েকের সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং তিনি জানতে পারেন বিষ্ণুবাবু একটি কৃষ্ণ মন্দির করতে ইচ্ছুক। তখন কিরণবাবু বলেন আপনি কৃষ্ণ মন্দিরের থেকে আরও ভালো একটি জীবন্ত কৃষ্ণের মন্দির করুন। তা শুনে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করলে বড়কালীতলা শিশু মন্দিরের প্রার্থনার সময় তাঁকে নিয়ে আসা হয় এবং সব দেখানো হয়। পরে তিনি প্রণবানন্দ পল্লীতে নিজের সঞ্চিত অর্থে জায়গা কিনে একটি শিশুমন্দির প্রতিষ্ঠা করে দেন। যা এখন বেশ সুন্দর ভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

১৯৯৫ সালে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতনে টর্নেডো ঝড়ে লোকেদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং এতে কয়েকজন মারাও যান। যারা আহত হয়েছিলেন তারা জেলার বিভিন্ন চিকিৎসা কেন্দ্রে ভর্তি হন। মেদিনীপুর শহরের হাসপাতালে যারা ছিলেন সরকারি ভাবে চিকিৎসা করা হলেও বেশ কিছু জিনিসের অভাব তারা অনুভব করেছিলেন। এ সময় শহরের শিশু মন্দিরগুলি আহতদের প্রয়োজন মতো গামছা, চিরুনি, আয়না, ফল মিষ্টি ইত্যাদি কিনে শিশুদের নিয়ে হাসপাতালে উপস্থিত হন শিশু ভাই-বোন ও আচার্য-আচার্যারা। জিনিসগুলি শিশুদের মাধ্যমে ওই আহত ব্যক্তিদের হাতে তুলে দিলে তাদের চোখ আনন্দাশ্রুতে ভরে যায়। তাঁরা ছোট ছোট শিশুদের সেবাপরায়ণতা দেখে অবিভূত হয়ে যায়। এছাড়া ১৯৯৯ সালে কার্গিল যুদ্ধে যে সকল বীর সৈনিক শহীদ হয়েছিলেন, তাঁদের পরিবারের সাহায্যার্থে এবং রাষ্ট্রসুরক্ষা কোষ মজুবত করতে ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা সংগৃহীত লক্ষাধিক অর্থ প্রধানমন্ত্রীর নিকট পাঠানো হয়। ওড়িশার ঘূর্ণিঝড়ে, গুজরাটের ঝঞ্ঝাবর্তে দক্ষিণবঙ্গের বন্যায়, গুজরাটের ভূমিকম্পে, সমুদ্রতটে সুনামি ও আয়লার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপন্ন মানুষের সহমর্মী হয়ে তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে।

শ্রেণী কক্ষে পঠন-পাঠনের মান বৃদ্ধির জন্য আধুনিক বিজ্ঞান- প্রযুক্তি প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, সাহস, সমরসতা প্রভৃতি গুণের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে প্রান্তীয়, ক্ষেত্রীয় ও অখিল ভারতীয় শিশু সম্মেলন, ক্রীড়া সমারোহ, সংস্কৃতি-জ্ঞান পরীক্ষা ও বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা হয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ক্রীড়া সমারোহ, সংস্কৃতি-জ্ঞান পরীক্ষা ও বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা হয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র-ছাত্রীরাও উক্ত প্রতিযোগিতাগুলিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে সফলতা লাভ করছে। তাদের সুপ্ত প্রতিভাগুলির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সম্ভব হচ্ছে।

ফলস্বরূপ প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা আজ তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে নিজ প্রতিভায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে অনেক ছাত্র-ছাত্রী বিদেশে কর্মরত ও গবেষণারত।

২০১০ সালে শিশু, অভিভাবক এবং সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিদের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে ১০০০ জনের মধ্যে একটি সমীক্ষা চালানো হয়। সমীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল— শিশু মন্দিরের সামাজিক নির্ভর যোগ্যতা নিরূপণ, শিক্ষায় গুণগত মানের দিকগুলি চিহ্নিত করা, শিশুমন্দিরের সঙ্গে অন্য বিদ্যালয়ের গুণগত মানের পার্থক্য এবং সমাজের প্রতি শিশুমন্দিরের দায়বদ্ধতা। এতে সকলেই স্বাধীনভাবে তাদের মত প্রকাশ করেন। সকলেই সাধারণভাবে আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির বিশেষত্বকে বিশেষ ভাবে তুলে ধরেন। এর প্রয়োজনীয়তা এক বাক্যে স্বীকার করেন। ■

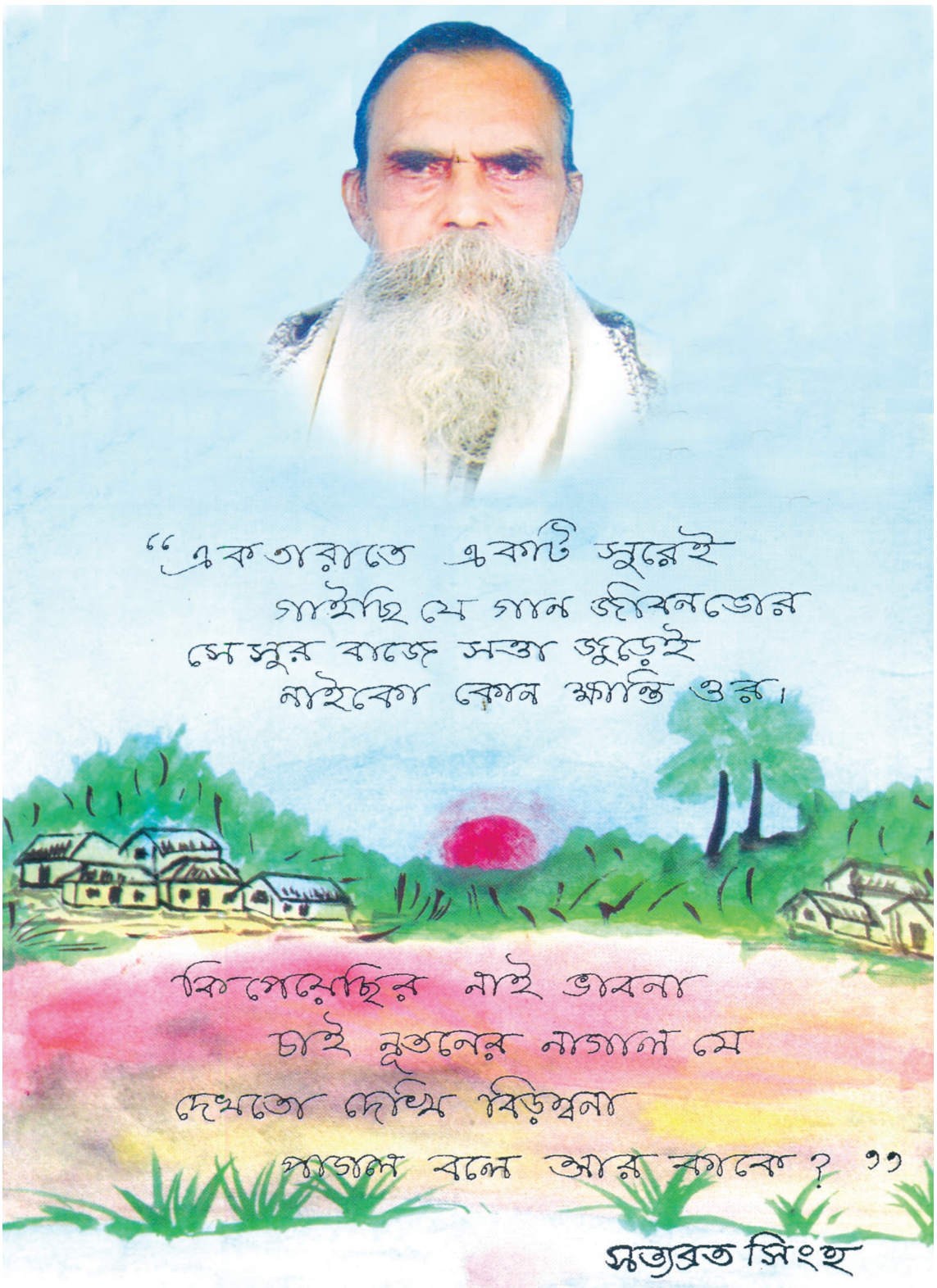

"একতারাতে একটি সুরেই
গাইছি যে গান জীবনভোর
সে সুর বাজে সত্তা জুড়েই
নাইকো কোন ক্ষান্তি ওর।
কি পেয়েছি'র নাই ভাবনা
চাই নূতনের নাগাল যে
দেখতে দেখি বিড়ম্বনা
পাগল বলে আর কাকে?"
সত্যব্রত সিংহ

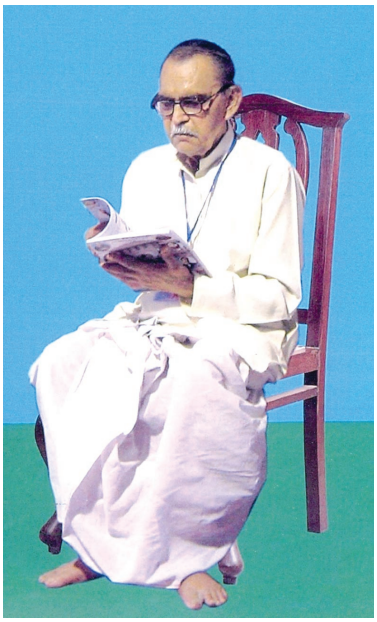

আমাদের সত্যদা

রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্যব্রত সিংহ (সর্বজনের সত্যদা) আজ আমাদের মধ্যে নেই। গত ১৮ আগস্ট, ২০১৫ মঙ্গলবার তিনি পার্থিব দেহ ছেড়ে সাধনোচিত ধামে গমন করেন। তিনি বহরমপুর শহরের গোরাবাজার এলাকার বাবুপাড়ার বিখ্যাত সিংহ বাড়ির সুসন্তান। পিতা ভবানীচরণ সিংহ তিন কন্যা, চার পুত্র, সতীসাধ্বী স্ত্রী সমেত ভরা-সংসার ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়ে অধ্যাত্ম মার্গে চলে যান। অবশ্যই স্ত্রী বীণাপানি দেবীর অনুমতি নিয়ে। ভাই বোন সাতজনের মধ্যে দিদি সমেত তিন বোন রামকৃষ্ণ সারদা মঠের সন্ন্যাসিনী। বড়দা দেবব্রত সিংহ এবং সত্যব্রত সিংহ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক। বড়দি এবং বড়দা আগেই স্বর্গত হয়েছেন। সত্যব্রত সিংহও চলে গেলেন। বাংলার এক পরিবার থেকে পিতা সমেত ছয়জন দেশের-দশের হিতে জীবন উৎসর্গ করার উদাহরণ অবশ্যই বিরল।

১৯৬০ সালে সত্যদার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। ১৯৬০ সালে বি.এস.সি. পরীক্ষা দিয়ে আমি বিস্তারক হিসাবে যাবার সংকল্প করি। তখন বাংলার প্রান্ত প্রচারক বসন্তরাও ভট্ট আমাকে মুর্শিদাবাদ জেলায় বিস্তারক হিসাবে পাঠালেন। স্বর্গীয় জয়দেবদা (অহীন্দ্র কুমার দে) তখন নদীয়া জেলা প্রচারক, আমাকে সঙ্গে নিয়ে বহরমপুরে সিংহ বাড়িতে উঠলেন। ওখানে আমার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হলো। তখন সত্যদা পদার্থ বিজ্ঞানে স্নাতক হয়ে উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলায় শিক্ষকতা করছেন। ছুটিতে বাড়িতে আসায় তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। এই সাক্ষাৎ দীর্ঘকালীন বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

'রত্নগর্ভা মা'য়ের কথা শুনেছি। বহরমপুরে 'রত্নাগর্ভা মা' শ্রীমতী বীণাবানি দেবীকে চাক্ষুষ করলাম। একদিন আমি মাকে জিজ্ঞাসা করলাম— 'আপনার স্বামী এতবড় সংসারের দায় আপনার মাথায় দিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেলেন। আপনার বড় মেয়ে সারদা মঠে সন্ন্যাসিনী হয়ে চলে গেলেন। আপনার মনে কোনো ক্ষোভ, দুঃখ, নালিশ নেই?' তিনি শান্ত ভাবে বললেন,— ''রণেন, কেউ যদি ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যেতে চায় আমি বাধা দেব? না, আমার কোনো ক্ষোভ নেই, কোনো দুঃখ নেই, কোনো নালিশ নেই।'' এই না হলে দেবুদা, সত্যদা, মায়াদি, ভারতীদি, জবাদির মা! এই রত্নগর্ভা জননীর অকুণ্ঠ স্নেহ-ভালবাসা আমি পেয়েছি, ধন্য আমার জীবন।

একবার সঙ্ঘের বিস্তারক হিসাবে বীরভূমের লোকপাড়া শাখায় আমার প্রবাস ছিল। সত্যদা তখন লোকপাড়া হাইস্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক। আমার রাত্রে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা সত্যদার ওই ঘরেই। বন্ধুবর রথীন চক্রবর্তী তখন বীরভূম জেলা প্রচারক। তিনি আমাকে আগেই বলে রেখেছিলেন। সত্যদাকে সেইমতো জিজ্ঞাসা করলাম— ''সত্যদা বয়স তো হয়েছে, সংসার ধর্ম করবেন?'' তাঁর সংক্ষিপ্ত উত্তর— ''না, ও লাইনে নেই।'' আমি বললাম— ''তাহলে স্কুলমাস্টারি আর লোকপাড়ার একটা শাখা নিয়ে কেন থাকবেন? প্রচারক হয়ে যান দশ-বিশটা শাখা চালাবেন।'' তিনি বললেন— ''রথীনদাও কয়েকবার বলেছেন, আপনিও যখন বলছেন তখন ভেবে দেখব।'' কলকাতায় ফিরে কিছুদিন বাদে খবর পেলাম সত্যদা স্কুলের শিক্ষকতা ছেড়ে ১৯৮১ সালে সঙ্ঘের প্রচারক হয়েছেন। খবরটা শুনে খুবই আনন্দ হলো।

ফর্সা, একহারা চেহারা, অত্যন্ত মেধাবী, স্কুল কলেজ জীবনে বহরমপুরে নামকরা ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন তিনি। ছাত্রদরদি কৃতী শিক্ষক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। আমৃত্যু সঙ্ঘের প্রচারক জীবনও তাঁর অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল। সুবক্তা, সুতার্কিক, স্পষ্টবাদী, সুগায়ক, সুলেখক, সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী ছিলেন তিনি। হোমিওপ্যাথি, ছবি আঁকা, কবিতা লেখা, বংশীবাদন ও জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁর বিশেষ রুচি ও দক্ষতা ছিল। এক কথায় বহুগুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। বীরভূম জেলা প্রচারক, মেদিনীপুর বিভাগ ও ২৪ পরগনা বিভাগ প্রচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে। ১৯৯৩ সালে তাঁর উপর পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের বৌদ্ধিক প্রমুখের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। অত্যন্ত নিষ্ঠা ও যোগ্যতার সঙ্গে সে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৭ সালে 'বিদ্যাভারতী' অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গের বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের সহ-সংগঠন সম্পাদকের দায়িত্ব এল তাঁর উপর। এখানেও তিনি তাঁর নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও কর্মকুশলতার ছাপ রাখলেন। উত্তরবঙ্গে সারদা শিশু তীর্থ এবং দক্ষিণবঙ্গে সরস্বতী শিশু মন্দির নামে শত শত প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় চলছে। এইসব বিদ্যালয়গুলিকে আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করার পিছনে সত্যদার অবদান বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। ২০০৭ সাল থেকে উভয়বঙ্গের মার্গদর্শক হিসাবে আমৃত্যু প্রেরণা দিয়ে গেছেন। শেষ জীবনে তিনি দাড়ি কাটা বন্ধ করলেন। শ্বেতশুভ্র দাড়িতে তাঁকে সন্তের মতো মন হতো। একজন কর্মযোগী বন্ধুবরকে সন্তে রূপান্তরিত হতে আমি দেখেছি, এটা কী কম সৌভাগ্যের? ইংরেজি প্রবাদ বাক্যকে তাঁর সম্বন্ধে ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে— "He was a Master of all trades Jack of None"। অমৃতময় লোকে চলে গেলেন তিনি পুনরাগমনের জন্য। তাঁর স্বর্গীয় আত্মার প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম।

(লেখক আর এস এসের প্রাক্তন পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক)

তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশুমন্দির এক আদর্শ বিদ্যালয় হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে

একটি আদর্শ শিক্ষালয় হিসাবে সারদা শিশুমন্দির সুপরিচিত এক নাম। ৬ নং জাতীয় সড়কের পাশে হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ার এই বিদ্যালয়ে ত্রিশ বর্গকিলোমিটার এলাকা থেকে প্রায় এক হাজার শিশু পড়তে আসে। শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে পুঁথিগত পাঠদানের সঙ্গে খেলাধুলা নাচ গান আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলির প্রতিও নজর দেওয়া হয়। শিশুমন্দিরের আচার্য-আচার্যাগণের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই তাঁতিবেড়িয়ার এলাকার অনেক শিশু ছাত্রছাত্রীই পরবর্তীকালে ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, শিক্ষক, অধ্যাপক হয়ে শিশুমন্দিরকে, সর্বোপরি সমাজকে গর্বিত

করেছে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন প্রান্ত সঙ্ঘচালক শ্রদ্ধেয় কেশব চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় এবং হাওড়া জেলার তৎকালীন সঙ্ঘচালক শ্রদ্ধেয় নারায়ণ চন্দ্র মল্লিক এবং স্থানীয় সমাজসেবী নিরাপদ পাল মহাশয় স্থানীয় তরুণদের সঙ্গে নিয়ে ১৯৮৫ সালের ২৬ জানুয়ারি ফুলেশ্বরে সরকার বাড়িতে সারদা শিশুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ১৯৮৯ সালে কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী স্মৃতি রক্ষা সমিতির সুবিস্তৃত পরিসরে এই শিশুমন্দির স্থানান্তরিত হয়।

সারদা শিশুতীর্থ সেবক রোড

বিমল কৃষ্ণ দাস ও পবন কুমার নকিপুরিয়ার প্রচেষ্টা এবং রবীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের দানে প্রতিষ্ঠিত হয় সারদা শিশুতীর্থ, সেবক রোড। ১৯৯৩ সালের বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম দিবসে। শিলিগুড়ির শিক্ষাপ্রেমী আপামর জনসাধারণের ভালবাসা ও দানে আজ বিদ্যালয়ের নিজস্ব দোতালা ভবন, ৩টি বাস বর্তমান। শুরুতে বিদ্যালয়ে অঙ্কুর থেকে প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হোত। আজ অঙ্কুর থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয়। প্রথমে শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৮৫ জন। বর্তমানে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৭৭৫ জন। হিন্দী

ও বাংলা দুটো ভাষায় পাঠদান করা হয়। প্রতিষ্ঠার সময় আচার্য-আচার্যা ও শিক্ষাকর্মীরা ছিলেন ৯ জন। আজ আচার্য-আচার্যা ও শিক্ষাকর্মীর মোট সংখ্যা ৫৫ জন। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন বিদ্যার্থীরা আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত। কেউ কেউ আবার দেশের সীমানার বাহিরেও চলে গেছে জ্ঞানার্জনের জন্য। আগামীতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়টিকে উন্নীত করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে পরিচালক সমিতি।

বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠান। ২০০৮ সালে। কলকাতার ইউনিভারসিটি ইন্সটিটিউট হলে। মঞ্চে রয়েছেন বিবি পরিষদের পূর্বতন সভাপতি অধ্যাপক অমল কুমার বসু, বিচারপতি শ্যামল কুমার সেন, সত্যব্রত সিংহ প্রমুখ।

বহরমপুর শহরের কাশিমবাজারে লাধুরাম তোষণিওয়াল সরস্বতী শিশুমন্দির মুর্শিদাবাদ জেলায় শিশুশিক্ষা ক্ষেত্রে আজ একটি উজ্জ্বল নাম। ২৬ বছর আগে অঙ্কুর থেকে চতুর্থ শ্রেণী নিয়ে শুরু হয়। পরে অষ্টম শ্রেণী। বর্তমানে মাধ্যমিকে উন্নীত হয়েছে। ২০১৫ সালে প্রাদেশিক ক্রীড়া সমারোহে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় শিশুমন্দিরের ভাই-বোনেরা দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করছে।

রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে শিশুমন্দিরের ছোট ছোট বোনেরা বর্ণাঢ্য নৃত্য পরিবেশন করছে।

শিলিগুড়ি শহরের সূর্যসেন কলোনির সারদা শিশুতীর্থ উত্তরবঙ্গ শিশুশিক্ষা আন্দোলনের পথিকৃৎ। ১৯৭৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর যাত্রা শুরু। সাড়ে তিন বিঘা জমির ওপর শিশুতীর্থটি তপোবনের আশ্রমের মতো। প্রথম প্রধান আচার্য বিমলকৃষ্ণ দাস। তাঁর যোগ্য পরিচালনায় শিশুতীর্থ আজ সমাজে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। বর্তমান প্রধানাচার্য অনিরুদ্ধ দাস। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের জন্য শিলিগুড়ির সিংহল পরিবার, রামপুরিয়া পরিবার, অধ্যাপক প্রলয় মজুমদার, সর্বোপরি লক্ষ্মীনারায়ণ ভালার প্রচেষ্টা অপরিসীম। চিত্রে শিশুতীর্থে শ্রেণীকক্ষে পড়াশোনায় মগ্ন শিশুরা।

অখণ্ড মেদিনীপুর জেলায় শিশুমন্দিরের যাত্রা শুরু ১৯৮৫ সালে। শহরের বক্সিবাজারে। দুই মেদিনীপুরে আজ ৬৯টি শিশুমন্দিরে ৮৫৪৭ জন শিশু পড়াশোনা করছে। বর্তমানে মেদিনীপুর শহরে ৫টি শিশুমন্দির ও ১টি বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আরো একটি সারদা বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলছে। চিত্রে শরৎপল্লী সরস্বতী শিশুমন্দিরের শিশুরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গম্ভীরা পরিবেশন করছে।

মেদিনীপুর শহরের শরৎপল্লী শিশুমন্দিরের ভাই বোনেরা বিভিন্ন প্রকারের গাছ লাগিয়ে বৃক্ষরোপণ দিবস পালন করছে।

পশ্চিমবঙ্গ শিশুশিক্ষা আন্দোলনের দুই পুরোধাপুরুষ

স্বর্গীয় অমলকুমার বসু

স্বর্গীয় অরুনেন্দু সরকার

শিলিগুড়ি সূর্যসেন কলোনি সারদা শিশুতীর্থের প্রাক্তন ভাই-বোনদের বছরে একবার একত্রিত হওয়া শুরু হয় ১৯৯২ সালে। ১৯৯৬ সালে তাঁরাই 'প্রাক্তন বিদ্যার্থী সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করেন। এই দীর্ঘ কালখণ্ডে শিশুতীর্থের ভাই-বোনেরা ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক, অধ্যাপক, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মচারী হিসেবে সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আনন্দের কথা, শিশুতীর্থের প্রাক্তনীরা সবাই প্রাক্তন বিদ্যার্থী সঙ্ঘের সদস্য। বর্তমানে প্রাক্তন বিদ্যার্থী সঙ্ঘের সভাপতি ডাঃ অমিতেশ দাস রায়।

ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার

আমরা সবাই ভারতবাসী। আমাদের দেশে অনেক আক্রমণ হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষ ভেঙে যায়নি। ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দের শেষদিকে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন এক মহাপুরুষ। তিনি হলেন ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর শিশুকালের একটি দেশপ্রেমের গল্প আমি উল্লেখ করছি— ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার যে পাঠশালায় পড়াশোনা করতেন সেই পাঠশালার পাশেই ছিল একটি দুর্গ। সেই দুর্গের উপরে বৃটিশ পতাকা লাগানো ছিল। তা দেখে তিনি তাঁর বন্ধুদের বললেন যে, ''দেখ এই দুর্গের উপরে বৃটিশ পতাকা লাগানো আছে। আমরা ভারতবাসী, আমাদের উচিত সেই পতাকা নামিয়ে আমাদের 'গৈরিকধ্বজ' লাগানো।'' বন্ধুদের বললেন যে ''আমরা সুড়ঙ্গ তৈরি করে যাব।'' কাজ শুরু হলো। একদিন শিক্ষক মহাশয় সেই ঘরে গিয়ে দেখে তারা সুড়ঙ্গ তৈরি করছে। তখন তিনি অবাক হয়ে বললেন, ''এ তোমরা কী করছ?'' তখন কেশব সব কথা খুলে বললেন। শিক্ষক মহাশয় মনে মনে খুশি হলেন। এথেকে বোঝা যাচ্ছে যে তিনি কতটা দেশভক্ত ছিলেন। তিনি বর্তমানে ডাক্তারজী নামে বিখ্যাত।

রাতুল দত্ত, পঞ্চম শ্রেণী সারদা বিদ্যামন্দির, নকশালবাড়ি

গ্রাম ও শহর

গ্রামে বাড়ি গ্রামেই থাকি
গ্রামকে খুবই ভালবাসি।
সেখান থেকে রোজ সকালে
শহরেতে পড়তে আসি।
গ্রামের মানুষ কষ্ট করে
চাষের ক্ষেতে ফসল ফলায়,
শহরের ওই শ্রমিকরা সব
কারখানাতে যন্ত্র বানায়।

সায়ন্তন মণ্ডল, চতুর্থ শ্রেণী,
সরস্বতী শিশু মন্দির, বড়কালীতলা,
বাঁকুড়া

মনের ইচ্ছা

স্কুলে চলো, স্কুলে চলো
স্কুলে চলো ভাই,
লেখাপড়া শিখে আমরা
মানুষ হতে চাই।
পিতামাতা গুরুজনের
আশিস লবো ভাই,
লেখাপড়া শিখে আমরা
মানুষ হতে চাই।

হেমন্ত মান্না, চতুর্থ শ্রেণী,
বিশ্বনাথ সরস্বতী শিশু মন্দির,
হামিরাগাছি, হুগলী

ইচ্ছে করে

ইচ্ছে করে, বাবুই হয়ে
তালগাছেতে বসি।
ইচ্ছে করে, আকাশ জুড়ে
পাখির মতো ভাসি।
ইচ্ছে করে, ডানা মেলে
যাই ব্যাঙ্গমীর দেশে,
ইচ্ছে করে, মাছ হয়ে
থাকব জলের নীচে।

দীপশিখা পাল, তৃতীয় শ্রেণী,
সরস্বতী শিশু মন্দির যমুনাবালী, মেদিনীপুর

বিকালের সূর্যি মামা

সূর্যি মামা সূর্যি মামা
থাকো তুমি আকাশে,
ভোরের বেলায় লাল রঙেতে
সুন্দর লাগে তোমাকে।
তুমি যদি না থাকতে,
হতো নাতো সকাল
আজকে তুমি যাচ্ছ চলে
আবার এসো কাল।

প্রিয়াসা কুণ্ডু, চতুর্থ শ্রেণী,
সরস্বতী শিশু মন্দির, বড়কালীতলা, বাঁকুড়া

রায়গঞ্জে সারদা শিশুতীর্থ থেকে সারদা বিদ্যামন্দির

সারদা বিদ্যামন্দির ইংরেজি মাধ্যমের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৯৫ সালের ১ মে। অরুণ, উদয়, প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চমশ্রেণী নিয়ে তখন সর্বমোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৯৭ জন। আচার্য ৭ জন। উল্লেখ্য, বাংলামাধ্যম শিশুতীর্থ ১৯৮৫ সালে শুরু হয়। রায়গঞ্জ তথা পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের অসহযোগিতায় ভারতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করা কঠিন হয়ে দাঁড়াতে থাকে। সরকারি অসহযোগিতা ও আইনি জটিলতা বাড়তেই থাকে। এমন সময় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের চতুর্থ সরসঙ্ঘচালক রজ্জুভাইয়া ১৯৯৪ সালে রায়গঞ্জে প্রবাসে আসেন। তখন তিনি সুপরামর্শ দেন যে ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয় খুললে কেন্দ্র সরকারের মান্যতা পাওয়া যেতে পারে। যেই বলা সুদর্শন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক উৎপলেন্দু সরকার সহ বহু কার্যকর্তাগণ কাজে লেগে পড়েন। সামাজিক চাহিদা, অভিভাবকগণের আস্থা, বিশ্বাস এবং আচার্য আচার্যাদের অক্লান্ত নিষ্ঠায় শিশুরা ভালো ফল করতে থাকে।

বর্তমানে ছাত্র সংখ্যা ১২৯৭ জন। ২০০৫ সালে সিবিএসই-র অনুমোদন প্রাপ্ত এই উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগ আছে। ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা আছে। পঞ্চমশ্রেণী থেকে ভর্তি নেওয়া হয় ছাত্রাবাসে। অন্যদের কেবলমাত্র অরুণ শ্রেণীতে। শিক্ষক সংখ্যা ৪৪, অন্যান্য সহায়ক সহায়িকা ৬, বাহনচালক ৩০। গত ২০১৪ শিক্ষাবর্ষে ৬ জন, ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে ৩ জন শিক্ষা মন্ত্রকের প্রশংসাপত্র পায়। বিদ্যামন্দিরের বহু ছাত্রছাত্রী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাঙ্ক ম্যানেজার ও প্রাইভেট সংস্থায় কাজ করছে। সারদা বিদ্যামন্দির সিবিএসই বোর্ডের X (AISSE) মাধ্যমিক রেজাল্টে জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করে। গত ২০১১—২০১৫ পর্যন্ত ১০০ শতাংশ পাশ শুধু নয়, ১০ জন ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে 10 CGPA প্রাপ্ত হয়।

বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদ এক মহান শিক্ষা আন্দোলন

ঋতা চক্রবর্তী

প্রায় ৩৩ বছর ধরে বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ নামক শিক্ষা সংস্থানের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে যুক্ত থেকেছি। তার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাভারতী, অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থানের এক অতি ক্ষুদ্র কর্মী হিসাবে নিজের জীবনের লক্ষ্য পূরণ করতে পেরেছি। কীভাবে হলো সঠিক কারণ জানি না। তবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার দশম অধ্যায়ে অর্জুনকে বললেন, 'যাঁরা ভক্তিযোগ দ্বারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করে নিত্য যুক্ত থাকেন, আমি তাঁদের শুদ্ধ জ্ঞানজনিত বুদ্ধিযোগ দান করি, যার দ্বারা তাঁরা আমাকে পান।' আরও বললেন, 'নাশয়ামি আত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা'। হয়তো তাঁর দান করা বুদ্ধিযোগ এবং জ্ঞানদীপ কোনো শুভমুহূর্তে তাঁর কৃপায় প্রজ্বলিত হওয়ার কারণে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কাজ ছেড়ে যোগদান করলাম এই ঈশ্বরীয় কাজে।

১৯৮২ সালে যখন প্রথম বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ গঠিত হয় তার প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণের মধ্যে ছিলেন হাওড়ার স্বর্গীয় অমলেন্দু বিকাশ ভট্টাচার্য ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। মূলত দ্বিজেনদার প্রচেষ্টায় শিবপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় সারদা শিশুমন্দির, রামকৃষ্ণপুর। তাঁরই ইচ্ছায় শিশুমন্দিরটি গড়ে তোলার দায়িত্ব নিই। সালটা ১৯৮৩। তখনও বিদ্যাভারতী বা বি.বি. পরিষদ বিষয়ে কোনো ধারণাই ছিল না। ১৯৮৬ সালে রাঁচিতে পূর্বাঞ্চল শিশুসঙ্গম অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দশ হাজার শিশু ভাইবোন এবং আচার্য-আচার্যা ও কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে সে এক মহাযজ্ঞের মহামিলন। দেখলাম আমাদের পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি, পুরুলিয়া, কোচবিহার থেকে ছোট ছোট শিশুদের নিয়ে এসেছেন আচার্য-আচার্যাগণ। দেখলাম পশ্চিমবঙ্গেও কাজ শুরু হয়ে গেছে। সেখানেই দেখা হলো বিজয়দার (বিজয়গণেশ কুলকার্ণী) সঙ্গে। হাওড়ায় সঙ্ঘের প্রচারক থাকার সময়ই তাঁর সঙ্গে পরিচয় ছিল। জানলাম বিদ্যাভারতী তাঁর ওপর বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের (তখন উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ একত্রে) সংগঠন সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছেন। তারপর নিজের কর্মপথ স্থির করতে কালবিলম্ব করিনি।

পেলাম স্বর্গীয় অমলদার (অমলকুমার বসু) কাছ থেকে এই ক্ষেত্রে কাজ করার সঠিক পথনির্দেশ। বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদকে আজকে সফলতার স্তরে পৌঁছে দেবার মূল কারিগর মনে হয় তিনিই। তখন আচার্য প্রশিক্ষণ হোত উত্তরবঙ্গে। অমলদা কাজ করতে শেখালেন। মাননীয় শিণ্ডেজীর আন্তরিক প্রশিক্ষণ প্রণালী আমাকে মুগ্ধ করত। সমৃদ্ধ হয়েছি মাননীয়া বত্রাজী, ভাইজী, লজ্জারামজীর মতো আদর্শ গুণীজনের বৌদ্ধিক ও পথনির্দেশে। ধীরে ধীরে কার্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে আচার্য প্রশিক্ষণ শুরু হলো। প্রশিক্ষণ প্রমুখের দায়িত্ব দিলেন অমলদা। সমস্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পরিকল্পনা হোত তাঁরই নির্দেশিত পথে। তবে স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র গান্ধী, যিনি পূর্বাঞ্চলে শিশুমন্দিরের স্থপতি তাঁর সান্নিধ্য এবং পথনির্দেশ পাওয়া আমার মতো নগণ্য আচার্যার কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয়। আমাকে এতটাই উপযুক্ত মনে করতেন যে, বিহারে আচার্য প্রশিক্ষণে শিশু মনোবিদ্যার ওপর বিষয় নিতে পাঠিয়েছিলেন। বিদ্যাভারতীর যোজনা অনুসারে শুরু হলো প্রাক্ প্রাথমিক স্তরে শিশুবাটিকা বিভাগ। গোপালী আশ্রমে শিশু মন্দিরে স্বর্গীয়া সুশীলা দাঁতের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হলো প্রথম শিশুবাটিকা বর্গ এক সপ্তাহের। সত্যি সত্যিই আচার্যাদের শিশুবাটিকা স্তরে কীভাবে মাতৃসমা হয়ে গড়ে তোলা দরকার তা জেনেছি সুশীলা দাঁতের কাছে।

৩৩ বছরের শেখা, জানা ও দেখার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা এই স্বল্প পরিসরে সত্যিই অসম্ভব। তবে যুবক যুবতীরাও কীভাবে এই সমস্ত মহান ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে ও পথনির্দেশে এই মহান শিক্ষা আন্দোলনে নিজেদের সামিল করে যোগ্য থেকে যোগ্যতর করে তুলেছেন তাও এক গবেষণার বিষয়।

পরিশেষে বলা যায় নিজের কাজের মূল্যায়ন নিজে করা যায় না। তবে আনন্দ পাওয়া যায়। শান্তি পাওয়া যায় যখন চলে যাবার আগে দেখে যাওয়া যায় পরবর্তী প্রজন্ম দৃঢ় পায়ে দাঁড়িয়ে গেছে, শক্ত হাতে সেই আলোকবর্তিকা এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য, তখন নিশ্চিন্তে তাঁর কাছে ফিরে যাওয়া যায়।

(লেখিকা বি বি পরিষদের প্রাদেশিক সদস্যা)

কোচবিহারে শিশু শিক্ষায় সারদা শিশুতীর্থ

জগদীশ কার্য্যী

কোচবিহারের 'সারদা শিশুতীর্থকে' শিশুশিক্ষা জগতে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বলা চলে। একটা সময় ছিল যখন শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনো নামি বিদ্যালয় কোচবিহারে ছিল না। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গতানুগতিক পাঠদানই ছিল একমাত্র ভরসা। ঠিক সেই সময় সারদা শিশুতীর্থের আবির্ভাব ঘটে। যারা শিশুদের শুধু পুঁথিগত শিক্ষাই নয়, ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সাজুয্য রেখে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাও দিয়ে থাকে। ১৯৮০ সালে বিদ্যালয় স্থাপনের ভাবনা নিয়ে স্থানীয় নৃপেন্দ্রনারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয়ে শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং বিদ্বজনদের নিয়ে একটি বৈঠকে শিশুদের উপযোগী একটি বিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আর তারই ফলস্বরূপ ১৯৮১ সালের ১৩ জানুয়ারি মাত্র ২১ জন ভাই-বোনকে (ছাত্র-ছাত্রী) নিয়ে শুরু হয় কোচবিহার সারদা শিশু তীর্থের পথ চলা। কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি শিশুমন্দিরে ভর্তির জন্য অভিভাবকদের সব আবেদন পত্র আমাদের গ্রহণ করা সম্ভব হোত না। একটা সময় এই বিপুল চাহিদার কথা মাথায় রেখে শহরের মানুষের ভালোবাসায় ও ইচ্ছায় সারদা শিশুতীর্থ (রায়ভবন) ছাড়াও শিশুতীর্থের আরও তিনটি শাখা তৈরি হয়েছে। সারদা শিশুতীর্থ (অনাদিভবন), সারদা শিশুতীর্থ (তপোবন) ও সারদা শিশুতীর্থ (সারদা নগর)।

এই সমস্ত শিশুমন্দির থেকে বিগত বৎসরগুলিতে যে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভাই-বোনেরা শিক্ষা গ্রহণ করে বেরিয়ে গিয়েছিল তাদের একটা বড় অংশই আজ দেশ-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত। বহু প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী এখনও ছোটবেলার বিদ্যালয়ে সেই সোনালী স্মৃতিকে মনের মণিকোঠায় ধরে রেখেছে।

কোচবিহার সারদা শিশুতীর্থের পথ চলার আজ ৩৫ বৎসর অতিক্রান্ত। সমালোচকরা যাই বলুন এখনও শিশুতীর্থগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে শিশু শিক্ষার মূল ভাবনাকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে সঠিক মানুষ গড়ার কাজে সদা নিরত রয়েছে। বর্তমানে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বিভিন্ন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে হয়তো ভিড় বেড়েছে। মানুষের ঝোঁক বা চাহিদাও হয়তো সেই কথা বলছে। তার মানে কিন্তু এই নয় যে বাংলা মিডিয়ামে কেউ পড়তে আসছে না। শিশুমন্দিরগুলির প্রতি এখনও মানুষের যথেষ্ট আস্থা আছে। কারণ পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি নীতিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কতখানি তা শহরের শিক্ষিত মানুষ ভালোভাবে জানেন। পাশাপাশি শিশু-মন্দিরগুলিতে পাঠদানের কৌশলে হোক বা পরিবেশগত মনস্তাত্ত্বিক কারণেই হোক শিশুদের প্রধান প্রধান বিষয়গুলোয় মজবুত ভিত গড়ে ওঠে। যার ফলে ছেলেমেয়েরা ইংলিশ মিডিয়ামে না পড়েও ইংরেজিতে যথেষ্ট দক্ষ হয়ে ওঠে। তেমনি গণিত, বিজ্ঞান, বাংলা, সংস্কৃত ও অন্যান্য বিষয়েও একই ব্যাপার ঘটে।

কোচবিহারে সারদা শিশুতীর্থের শিক্ষা প্রদানের প্রধান প্রধান বিষয়গুলোর ইতিবাচক দিকগুলো পরবর্তীকালে জেলার অন্যান্য প্রান্তেও ছড়িয়ে পড়ে। তাই সে সমস্ত স্থানেও শিশুমন্দির গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এরই ফলস্বরূপ অন্যান্য মহকুমা বা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে শিশুমন্দির গড়ে ওঠে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মাথাভাঙ্গা সারদা শিশুতীর্থ (১৯৮৫ সাল), পুণ্ডিবাড়ি সারদা শিশুতীর্থ (১৯৮৬ সাল), বলরামপুরে ভারতী শিশুতীর্থ (১৯৮৬ সাল), দিনহাটা সারদা শিশুতীর্থ (১৯৮৯ সাল), তুফানগঞ্জ সারদা শিশুতীর্থ (১৯৯০ সাল) ও আলিপুর সারদা শিশুতীর্থ।

এই শিশুতীর্থগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে খুবই সুনামের সঙ্গে শিক্ষাদানের কাজ করে চলেছে। মহকুমাগুলিতে তারা এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছে যে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানেও সকলের ইচ্ছায় নতুন অনেক শিশুমন্দির শুরু করতে হয়েছে। এভাবে বর্তমানে কোচবিহার জেলায় মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৮টি, (জেলায় বিদ্যাভারতীর অনুমোদন পায়নি এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা— ৪টি)।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা— প্রায় ১১ হাজার। আচার্য-আচার্যা (শিক্ষক-শিক্ষিকা)— ৭৩৫ জন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, এতদিন কোচবিহারে একটি উচ্চবিদ্যালয়ের অভাব আমরা অনুভব করছিলাম। খুবই আনন্দের খবর বিদ্যাভারতী পরিচালিত একটি উচ্চবিদ্যালয় আমরা পেতে চলেছি। গত কয়েক বৎসর হলো কোচবিহার ক্যান্সার সেন্টারের কাছাকাছি সারদানগরে সারদা শিশুতীর্থের প্রাথমিক বিভাগের পাশাপাশি 'সারদা বিদ্যামন্দির' নামে উচ্চবিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনও শুরু হয়েছে। সারদানগরের খোলামেলা মনোরম পরিসরে ছায়াঘেরা আশ্রমিক পরিবেশে প্রকৃতি পাঠের সঙ্গে সঙ্গে জোরকদমে এগিয়ে চলেছে উচ্চবিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন। বর্তমানে সেখানে পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত ভাই-বোনেরা পঠন-পাঠনের সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলা, শরীরচর্চা, নাচ-গান এবং সৃষ্টিশীল নানা বিষয় নিয়ে মেতে আছে। সবার আশীর্বাদ ধন্য এমন বিদ্যালয় আগামী দিনে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত উন্নীত হবার সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে।

আচার্য, সারদা শিশুতীর্থ, কোচবিহার

পঁচিশ বছরে সিউড়ির সরোজিনীদেবী সরস্বতী শিশুমন্দির

জিতেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বীরভূম জেলার সিউড়ি শহরের পাইকপাড়াস্থিত সরোজিনীদেবী সরস্বতী শিশুমন্দির বর্তমান বছরে রজত জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন করল। কালখণ্ডের নিরবচ্ছিন্ন ও অনন্ত সামগ্রিকতায় পঁচিশটা বছর তেমন কিছু নয়, কিন্তু সিউড়ি শহরের শিক্ষার পরিমণ্ডলে একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ের পঁচিশ বছর স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখে এগিয়ে চলা অবশ্যই উল্লেখের দাবি করতে পারে।

১৯৯১ সালের শ্রীপঞ্চমী তিথির এক শীতের সকালে আত্মপ্রকাশ করে ৭টি শিশুকে নিয়ে। আজ তার দুটি ভবন। একটি পাইকপাড়ায় প্রায় ১ বিঘা ২ কাঠায় ও অন্যটি রক্ষাকালীতলায় প্রায় ৯ বিঘা জায়গার ওপর উচ্চবিদ্যালয়ের ভবন। আর সেই ৭ জন আজ ১৩৫০ জন রূপে বিকশিত। তাদের সার্বিক বিকাশের জন্য ৫০ জন আচার্য-আচার্যা সদা সতর্ক। বর্তমানে অরুণ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান করা হয় দুটি বিভাগে। প্রাতঃ বিভাগ অরুণ, উদয় ও প্রভাত শ্রেণী এবং দিবা বিভাগ প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। শহরের তিনটি শিশুমন্দিরের মধ্যে পাইকপাড়া শিশুমন্দিরের শিশু সংখ্যা সর্বাধিক এবং গ্রহণযোগ্যতা শহর তথা জেলায় অনস্বীকার্য। সরোজিনীদেবী শিক্ষা সংসদ ট্রাস্টের অধীনে থাকা এই শিশুমন্দিরে ১০, ২০, ২৫ বছরের অভিজ্ঞ আচার্য-আচার্যার সংখ্যা ২০ জন। তাই এই শিশুমন্দিরে তারুণ্য ও অভিজ্ঞতার সুন্দর ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে। সেই ভারসাম্যকে আরও উন্নত করতে বছরে দুই থেকে তিনটি পঠন-পাঠন সংক্রান্ত কর্মশালা সংগঠিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হয়। যা মূলত শিশু ভাই বোনেরা আয়োজন করে আচার্য ও আচার্যাদের সহায়তায়। প্রাক্তন বিদ্যার্থীরা এই শিশুমন্দিরকে খুবই ভালোবাসে এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখে। শিশুমন্দিরে প্রাক্তন বিদ্যার্থীদের সুন্দর তালিকা ও প্রাক্তনী সংসদ আছে। প্রতি মাসে তারা একবার করে বৈঠকও করে এবং বছরে একবার প্রাক্তন বিদ্যার্থীদের সম্মেলন হয়। কৌস্তভ রায়, অতনু ব্যানার্জী, নাজিয়া সুলতানা, বন্ধুশ্রী গুপ্ত প্রভৃতি প্রাক্তন বিদ্যার্থীরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে।

এই শিশুমন্দির অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনুমোদন লাভ করেছে। এই শিশুমন্দিরে সমাজের ১৭ জন বিশিষ্ট মানুষ পরিচালন সমিতির সদস্য রূপে সর্বদা সক্রিয় আছেন। প্রতি তিন বছর এই সমিতির নবীকরণ করা হয়। এই শিশুমন্দিরে শিশু ও আচার্য-আচার্যা উপযোগী ১৩০০ বই সম্বলিত একটি ছোটো কিন্তু মূল্যবান গ্রন্থাগার আছে। শিশু ও আচার্য-আচার্যারা নিয়মিত গ্রন্থাগার থেকে পুস্তক আদান-প্রদান করেন। ২৫ বছরের এই শিশুমন্দির তার রজত জয়ন্তী বর্ষে নানাবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও ঋদ্ধ কার্যক্রম সফলভাবে ডদযাপন করেছে। বিশাল ও সমান্বত প্রভাত পথসঞ্চলন, শিশুসমাগম, সমাজের বিশিষ্ট মানুষ, বর্তমান ও প্রাক্তন আচার্য-আচার্যা-সহ স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বনামধন্যদের সম্মাননা জ্ঞাপন, ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান প্রদর্শনী, নানা প্রতিযোগিতা প্রভৃতি তার কিছু উদাহরণ মাত্র। সম্প্রতি এই শিশুমন্দিরের প্রধান আচার্য শ্রী জিতেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সারা ভারতব্যাপী প্রধান আচার্য সম্মেলনে যোগদান করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদী মহাশয়ের কাছ থেকে ভবিষ্যৎ পথের দিশা নিয়ে এসেছেন।

বিদ্যাভারতীর পাঁচ আধারভূত বিষয়ের নিয়মিত প্রয়োগ ও চর্চা রয়েছে। শারীরিক, সংগীত, সংস্কৃত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সমস্ত বিষয়েই সপ্তাহে নিয়মিত কালাংশ রয়েছে এবং বিষয়গত দাদাভাই দিদিভাই আছেন সাপ্তাহিক পাঠদান দেওয়ার জন্য। শারীরিক বিকাশের জন্য নিয়মিতভাবে যোগ শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নিয়মিত বিকালে খেলাধুলার পাঠ রাখা হয়েছে।

ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা এখন নেই। ভবিষ্যতে করার পরিকল্পনা আছে। আমাদের উচ্চবিদ্যালয়ের জন্য যে কাজ চলছে সেখানে ১৩,৫০০ বর্গ ফুট এলাকা নিয়ে ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। মোট জায়গা প্রায় ৯ বিঘা, যেখানে ছাত্রাবাস করার পরিকল্পনা চলছে। এছাড়াও একটি বালিকা বিদ্যালয় করার পরিকল্পনা রয়েছে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে জেলা ও শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এবং সমাজে এই শিশুমন্দিরের গ্রহণযোগ্যতা অনেকটাই। আশা রইল সকলের সদিচ্ছা, আশীর্বাদ ভালোবাসায় এই শিশুমন্দিরের আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। আর এভাবেই সমাজের কল্যাণে এই শিশুমন্দির ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাবে।

প্রধানাচার্য

আমার চোখে শিশুমন্দির

চম্পা চট্টোপাধ্যায়

প্রতিটি মা-বাবার এই প্রত্যাশা থাকে তাঁর সন্তান বেড়ে ওঠার দীর্ঘ পথটি পেরতে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবে, সে যেন তার নিজগুণে তথা তার অন্তর্নিহিত শক্তি দিয়ে অনায়াসে সেগুলি জয় করতে পারে।

আমার শিশুকন্যা শ্রেয়সী একটু একটু করে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মা হিসেবে আমারও মনের মধ্যে চিন্তা হতে লাগল যে আমার সন্তানটি কেবল পড়াশোনায় নয় মনের দিক দিয়েও সে যেন একটি বড় মাপের মানুষে পরিণত হয়। বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন কিছু নৈতিক গুণাবলীর অধিকারী হয় যার দ্বারা ভবিষ্যতে সে শান্তিতে থাকবে এবং আর পাঁচজনকে শান্তিতে রাখবে। অর্থাৎ পাঠগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে শিশুটি যেন শিষ্টাচার, সহমর্মিতা, সহমত পোষণ, নম্রতা অহং শূন্য ইত্যাদি গুণেরও অধিকারী হতে পারে— এরূপ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা ভাবতে লাগলাম। ইতিমধ্যে বড়কালীতলায় বাঁকুড়া গার্লস হাই স্কুলের প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়ে ভর্তি হয়েছে। কিছুদিন পরে এই বিদ্যালয়টির পাশেই বৈপ্লবিক বাড়িতে 'সরস্বতী শিশু মন্দির' শুরু হয় যেটি একটি সর্বভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদ্যাভারতী অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থানের অন্তর্গত এবং বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদ দ্বারা পরিচালিত— স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শে গড়া। যা ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতি পরম্পরার অনুগামী। এরপর মেয়েকে শিশুমন্দিরে ভর্তি করি। মেয়ের মানসিক পরিবর্তনে অনুভব করি এক্ষেত্রে আমার সিদ্ধান্তই সঠিক। তারপর আমার পুত্রসন্তান শীলভদ্রও এখান থেকে চতুর্থশ্রেণী পর্যন্ত পাঠগ্রহণ করে।

দাদাভাই ও দিদিভাইদের প্রতিটি শিশুর প্রতি লক্ষ্য ও যত্নবান হওয়া এবং দিদিভাইদের মাতৃসুলভ মমতা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাছাড়া মাসিমার স্নেহপূর্ণ পরিচর্যা এবং পরিবহণকর্মীদের দায়িত্ববোধ ও সচেতনতা ভোলা যায় না।

শিশুমন্দিরের অনুকূল পরিবেশ শিশুটি বাড়িতে যাতে পায় অর্থাৎ শিক্ষার সঙ্গে যে সকল সুসংস্কার তার মধ্যে গড়ে উঠছে বাড়িতেও যাতে সেই সংস্কার থাকে এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য বছরে অন্তত দু'বার প্রতিটি শিশুর বাড়ি দাদাভাই-দিদিভাইরা যান এবং আগ্রহ সহকারে সে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেন। এছাড়া মাঝে মাঝে মাতৃসম্মেলন করে শিশুর বিকাশ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেন ও সঠিক পথের দিশা দেখান। এরূপ সম্মেলন শিশুর সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক নিবিড় করে, মায়েরা তাদের সন্তানদের প্রতি আরও যত্ন নেন।

বিদ্যালয়ের শুরুতে মাতৃবন্দনা কার্যক্রম যা শিশু ভাইবোনেরা আচার্য-আচার্যা সকলে মিলে করে থাকেন— সেখানে থাকে সরস্বতী বন্দনা, একাত্মতা স্তোত্র, মহাপুরুষদের বাণী থেকে পাঠ, গায়ত্রীমন্ত্র পাঠ, শান্তি পাঠ ইত্যাদি যা শিশুদের মনের একাগ্রতা বাড়াতে ও মনকে পবিত্র রাখতে যথেষ্ট সাহায্য করে। পৃথিবীর সকলের জন্য শান্তি কামনা করে শান্তি পাঠ বিষয়টি আমাকে খুব অভিভূত করে।

আমার ছেলেমেয়ে দু'টির প্রাথমিক শিক্ষা এই শিশু মন্দিরেই। মেয়েটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী ছাড়িয়ে গবেষণায় রত এবং ছেলেটি নরেন্দ্রপুরে স্নাতকের পাঠ শেষ করে আই আই টি-তে স্নাতকোত্তর পাঠরত। কিন্তু শিশুমন্দিরের সংস্কার তাদের মধ্যে যে মূল্যবোধ গড়ে দিয়েছে এখনও তা হারায়নি। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও কর্তব্য সম্পর্কে সদা সচেতন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বললেই নয়, কিছুদিন আগে দুর্গাপুর বাসস্ট্যান্ডে একজন আত্মীয় পরিজনহীন অসহায় বৃদ্ধা চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন জনের কাছে সাহায্য চাইছে দেখে তাকে ডেকে জানতে চাইল আর কত টাকা হলে তার সব ওষুধ কেনা যাবে এবং তারপর আমার ছেলে বাকি সবটুকু টাকা ওই বৃদ্ধাকে দেয়। ভাবি এতখানি মূল্যবোধ সে পেল কোথা থেকে? শিশুমন্দিরের শিক্ষাই তার এই মূল্যবোধ শিখিয়েছে। আমার মেয়েটির কথা না বললে এই লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তার জলপানি থেকে নিয়মিতভাবে ফুটপাতে পড়ে থাকা অসহায় বুড়ো-বুড়িদের ওষুধ, ফল, শীতবস্ত্র দিয়ে থাকে। শুধুমাত্র আমার ছেলেমেয়েই নয় তাদের শিশুমন্দিরের বন্ধু ও বান্ধবীদেরও একই মনোভাব।

শিশুমন্দিরে আমার সন্তান দুটিকে পড়াতে না পাঠালে আমি মনে করি আমি নিজেও অনেকাংশে অপূর্ণ থেকে যেতাম। শিশুমন্দিরের বাতাবরণ আমার পেশাগত দক্ষতাবৃদ্ধি ও ছাত্রছাত্রীদের অনুসরণ যোগ্য রূপে নিজেকে গড়ে তুলতে অনেকটাই সাহায্য করেছে। পদমর্যাদা বোধের অহমিকাকে দূরে সরিয়ে নিছক ভালোবাসা দিয়ে আমার ছাত্রীদের আপন করে কাছে টানতে পেরেছি।

আমি শিশুমন্দিরের একজন শুভানুধ্যায়ী। শিশুমন্দিরের ছাত্রছাত্রীদের বাইরের কোনো বিদ্যালয়ে পড়তে যেতে যেন না হয়। বাঁকুড়া শহরে একটি শিশুমন্দির যেন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হয় একজন অভিভাবিকা হিসাবে ঈশ্বরের কাছে এটুকু আমার প্রার্থনা।

(প্রাক্তন অভিভাবিকা)
বাঁকুড়া বড়কালীতলা সরস্বতী শিশুমন্দির
শিক্ষিকা, বাঁকুড়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়,
কালীতলা

শিশু মন্দিরের সঙ্গে আজও আমার সম্পর্ক রয়েছে

কাবেরী ভট্টাচার্য

একটি শিশুর মানসিক বিকাশে পরিবারের ভূমিকা বিশেষ করে মায়ের ভূমিকা বেশি থাকে। আবার যদি শিশুটি সঠিক বিদ্যালয়ে গিয়ে জীবনের প্রথম পাঠ গ্রহণ করে, তবে তারা আরও সমৃদ্ধ হয়। আমাদের বাড়ির কাছেই তাজপুর সরস্বতী শিশু মন্দির আমার দুই মেয়ের মানসিক বিকাশে যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। এই শিশু মন্দিরের প্রথম দিনের ঘটনা আজও আমার মনে আছে। বড় মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসছি, দেখি মেয়ে কেঁদেই চলেছে। একটু অস্বস্তি বোধ করছি হঠাৎ দেখি বড় দাদাভাই ছুটে এসে সস্নেহে কোলে তুলে তার কান্না ভোলাতে লাগলেন। শুধু আমার মেয়েকেই নয়, যদি কখনও প্রথমদিন কোনো শিশুকে নিয়ে শিশুমন্দিরে যান, দেখবেন তাদের কান্না আকাশকে ভারী করে তুলেছে। কিন্তু এতে চিন্তার কিছু নেই। কারণ দাদাভাই, দিদিভাই, মাসিমাদের আন্তরিক ভালবাসায় শিশুরা অচিরেই বাড়ির পরিচিত পরিবেশ পেয়ে যায়। তখন দেখা যায় শিশুরা আর স্কুল কামাই করছে না, স্কুলে যাবার জন্য আগেই তৈরি হয়ে যাচ্ছে। আমরা যখন পড়েছি, বিদ্যালয়ে না যাবার জন্য কত বায়না করেছি, তখন বিদ্যালয় ভীতি, শিক্ষক ভীতি একটা কাজ করত। আর এদের এত আগ্রহ কেন?

এই 'কেন'র উত্তর শিশুমন্দিরের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক না থাকলে পাওয়া যাবে না। এখানকার সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা আমাকে মুগ্ধ করেছে। শিশুমন্দিরে প্রার্থনা যে কোনো দেব মন্দিরের প্রার্থনার সঙ্গে তুলনীয়। প্রতিদিন সেখানে কোনো না কোনো শিশুর জন্মদিন পালন, অমৃতবচন, সুভাষিতম্, সংস্কৃত শ্লোক শুনে হতবাক হয়েছি। শিক্ষাদানের ব্যাপারে কিছু বলার নেই। কারণ শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। শিশুর কাছ থেকে মনের কথা কীভাবে জানা যাবে তার সুন্দর ব্যবস্থা শিশুশ্রেণীগুলিতে আছে। বিশেষ করে হাতের লেখায় প্রথম থেকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। একটি বর্ণ বা সংখ্যা কীভাবে লিখতে হয়, আমরা অনেকে জানি না। এখানে সঠিক ভাবে শেখানো হয়। এছাড়া একটি শিশুর মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা আছে, তাকে তুলে ধরতে দাদাভাই দিদিভাইরা সাহায্য করেন। শিশু মন্দিরের শিশুবাটিকা, শিশুসভা, শিশুভারতী শিশুদের নানা প্রতিভাকে তুলে ধরে। কবিতা, নাচ, গান, শারীরিক কলাকৌশল, বিশেষ করে বার্ষিক বা অন্যান্য অনুষ্ঠান সঞ্চালনার কাজ করে শিশুরাই। আমরা অভিভাবক, অভিভাবিকারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই, যখন দেখি আমাদের বাড়ির শিশুরা মঞ্চে এসব করছে। শিশুদের মুখে সুললিত সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ অনেককে লজ্জা দেবে। শিশুদের শারীরিক কসরত সার্কাসের কথা মনে করিয়ে দেয়। এসবের নেপথ্য কারিগর অবশ্য দাদাভাই দিদিভাইরাই। আর একটি জিনিস আমার ভাল লেগেছে--- চিরাচরিত স্যার, মাস্টারমশাই ডাক বাদ দিয়ে দাদাভাই, দিদিভাই, মাসিমা, ভ্যানকাকু ইত্যাদি ডাকের মধ্যে নিবিড় আত্মীয়তার সুর শোনা যায়। অপর একটি বিশেষ দিক, সেটি হলো প্রায় প্রতিটি শিশুর নাম মনে রাখা। এটা ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে আন্তরিক ভালবাসা না থাকলে হয় না। আজ আমার মেয়েরা ওই শিশু মন্দির থেকে পাঠ গ্রহণ শেষ করে অন্য বিদ্যালয়ে গিয়েছে। কিন্তু শিশু মন্দিরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছেদ হয়নি। আজও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাই। সবার সঙ্গে দেখা হয়। মনে হয় যেন নিজের বাড়িতে এলাম। এই তাজপুর সরস্বতী শিশু মন্দির ইতিমধ্যেই গ্রাম গ্রামান্তরে বিশেষ সুনাম অর্জন করে চলেছে। আমি এই শিশু মন্দিরের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

—প্রাক্তন অভিভাবিকা, তাজপুর সরস্বতী শিশুমন্দির, হুগলী।

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে

SIP করুন, উন্নতি করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

২০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ১.০১ কোটি টাকা, মোট বিনিয়োগ ৪.৮ লাখ টাকা মাত্র।

মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

DRS INVESTMENT

Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond

কোলকাতা, হাওড়া • Email : drsinvestment@gmail.com

9830372090

9748978406

‘‘মাথায় কতকগুলি তথ্য ঢুকানো হইল, সারা জীবন হজম হইল না, অসম্বদ্ধভাবে সেগুলি মাথায় ঘুরিতে লাগিল— ইহাকে শিক্ষা বলে না। বিভিন্ন ভাবকে এমনভাবে নিজের করিয়া লইতে হইবে, যাহাতে আমাদের জীবন গঠিত হয়, যাহাতে মানুষ তৈরি হয়, চরিত্র গঠিত হয়। যদি তোমরা পাঁচটি ভাব হজম করিয়া জীবন ও চরিত্র ঐভাবে গঠিত করিতে পার, তবে যে-ব্যক্তি একটি গ্রন্থাগারের সবগুলি পুস্তক মুখস্থ করিয়াছে, তাহার অপেক্ষা তোমার অধিক শিক্ষা হইয়াছে বলিতে হইবে।’’

— স্বামী বিবেকানন্দ (বাণী ও রচনা, ৫/১৫৪)

With Best Compliments from -

Sahitya Bharati Publication Pvt. Ltd.

51/1A, Jhamapukur Lane
Kolkata - 700 009
Phone : 2360-5062, 2360-5064
Website : www.sahityabharatipublications.com
E-mail : info@sahityabharatipublications.com

ঈশ্বরের কাছে শিশুমন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি

চন্দন চৌধুরী

সেটা ১৯৯৫ সাল। আমার প্রথম সন্তান সৌরভ চৌধুরীকে ভর্তি করলাম সরস্বতী শিশুমন্দিরে। বিখ্যাত বৈপ্লবিক বাড়ি— তার ঐতিহাসিক মেদুরতায় পূর্ণ পুরানো চুনসুরকির দেওয়াল আর কড়িকাঠের ছাদ আচ্ছাদিত ঘরগুলিতে পঠন-পাঠনের শুরু। বড়কালীতলার এই বাড়িতে সবে শিশুমন্দির অনেক প্রত্যাশা জাগিয়ে তার পথ চলা শুরু করেছে, সালটা বোধহয় ১৯৯৩। সেদিনের শিশুমন্দির বেল অন্যান্য গাছ সম্বলিত নিকানো উঠোন-চারদিক মনীষীশোভিত আশ্রমিক পরিবেশ— সুমধুর প্রার্থনা সঙ্গীত— সবের মধ্যে সুমহান আয়োজন আমাকে প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ করে। ততোধিক মুগ্ধ করে তৎকালীন দাদাভাই-দিদিভাইদের অমায়িক ব্যবহার। শিশুমন্দিরের সঙ্গে আমার একাত্মতা বাড়তে থাকে অমোঘ নিয়মে। পঠনপাঠনের পদ্ধতিগত দিকগুলি যেন নতুন পথের দিশারি। পাঠদানের তথাকথিত কেতাবি কাঠিন্য— পড়ানোর নামে শাসন— এসব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে সেদিনের দাদা-দিদিভাইদের মধ্যে দেখেছি ছাত্রছাত্রী হিসেবে নয়— নিজের ভাই-বোন হিসেবে যত্নশীল হতে। ফলে শিক্ষারম্ভের প্রথমধাপ অঙ্কুর থেকেই ভাই-বোনেরা এখানে ভয় মুক্ত হয়ে পড়াশোনাটিকে গ্রহণ করেছে চাপহীন খেলা হিসেবে। পরীক্ষা নামক যান্ত্রিক কলে তারা এখানে নিষ্পেষিত হয়নি। মজার ছলে— আনন্দের রঙে নিজেরা তাই সাময়িকী পরীক্ষা, অর্ধবার্ষিকী পরীক্ষা, বার্ষিক পরীক্ষা সবেতেই কৃতিত্ব অর্জন করেছে। শিশুর বিকাশ সম্পর্কে দাদাভাই ও দিদিভাইরা অভিবাক- অভিভাবিকাদের আগ্রহী করে তুলতে পেরেছিলেন অতি সহজেই। বিদ্যামন্দির ছাড়িয়ে তাই তাদের সঙ্গে আমাদের মতো অভিভাবকদের সম্পর্ক ঘরের চৌকাঠমাড়িয়ে অন্দরমহল পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল সাবলীলভাবে। শিশুদের মানসিক-নৈতিক মানোন্নয়নে প্রয়োজনের বাইরেও তারা শিশুদের বাড়ি বাড়ি সাক্ষাৎ করেছেন, শিশু ও তাদের বাবা-মায়ের সঙ্গে শিশুর আরো বিকাশলাভের জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। ভারতবর্ষের আর কোনো বিদ্যালয় ঠিক এমনভাবে শিক্ষাপদ্ধতিকে প্রসারিত করেছে কিনা— আমার জানা নেই। দাদাভাই- দিদিভাইরা অনেকেই এত বছর পরেও আমার স্মৃতিতে শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন। শান্তি দাদাভাই, শ্যামল দাদাভাই, সোনালি দিদিভাই, মণিকা দিদিভাই-সহ মাধব ভাইও তৎকালীন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অকৃত্রিম ব্যবহার আজো আমার কাছে পরম গৌরবের ধন।

পড়াশোনার বাইরে যে বিরাট জগৎ— নানা জ্ঞানবিজ্ঞান মানসিক-নৈতিক-সামাজিক-শারীরিক সাংস্কৃতিক নানা প্রয়োজনের সুমহান আয়োজন— সেই আয়োজনের মহাযজ্ঞে শিশুতাপসদের স্বাভাবিক পরিচিতিকরণের যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শিশুমন্দির সুন্দরভাবে গ্রহণ করেছে, তা দৃষ্টান্তযোগ্য ও প্রশংসনীয়। আন্তর্জাতিক স্তরের অতি আধুনিক মনস্কতায় পরিপূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলনে এমন সাহসী পদক্ষেপ শিশুমন্দিরকেই মানায়। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সুপ্রাচীন বৈদিক ঐতিহ্য ও পরম্পরাগত উপাদানগুলিও শিশুমন্দিরের শিক্ষা পদ্ধতিতে যুক্ত হয়ে আছে। শিক্ষাকে সর্বাঙ্গীণ করে তুলতে শিশুমন্দিরকে বরাবর অতি তৎপর হতে দেখেছি। বিদ্যামন্দিরের পঠনপাঠন ভাইবোনদের জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধিতে তাদের নৈতিক চরিত্রকে দৃঢ় করতে এবং শারীরিকভাবে সক্ষম করে তুলতে বরাবর আগুয়ান। ফলে পরবর্তীকালে শিশুমন্দিরের ভাইবোনেরা অতি সচেতন নিয়মানুগ সৈনিক হিসেবে তাদের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রমাণিত করতে পেরেছে। এখানের ভাইবোনেরা দাদা-দিদিভাইদের প্রশিক্ষণে কেউ হয়ে উঠেছে সফল চিত্রকর, দক্ষ আবৃত্তিকার, লেখক, নৃত্যশিল্পী, নটশিল্পী, স্বাস্থ্যবান খেলোয়াড় বা সুপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী। বলাবাহুল্য এই গুণগুলিকে আবিষ্কার করে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে ভাইবোনদের শিক্ষিত করে তোলার কঠিনকাজ শিশুমন্দির করে আসছে তার নিজস্ব নিয়মে। এভাবেই একটি বিদ্যামন্দির ধীরে ধীরে ফলে-ফুলে বিকশিত হয়েছে আর আজকের বিরাট বৃক্ষছায়ায় আমাদের মতো অভিভাবক-অভিভাবিকারা আজও শান্তিপূর্ণ আশ্রয় নিয়ে চলেছি।

বাৎসরিক মূল্যায়নকে আরো বিজ্ঞানমনস্কতা সূচিত করে প্রতি বছর দু'বার করে নিয়মিত হেলথ্ চেকআপ করা হয়েছে শহরের নামি দামি চিকিৎসকদের সৌজন্যে। এভাবেই শিশুমন্দির তার জন্মলগ্ন থেকে সুবিশাল ডানা প্রসারিত করেছে আর এসবের সাক্ষী থাকতে পেরে অভিভাবক হিসেবে আমিও নিজেকে এক ঐতিহ্যবাহী গৌরবে গৌরব অনুভব করছি।

পরিশেষে একটু নিজের কথা বলি। আমার প্রথমপুত্র সৌরভ এই শিশুমন্দিরের শিক্ষালাভের মধ্য দিয়েই পরবর্তীকালে বাঁকুড়া জেলা স্কুল— আই আই টি উত্তীর্ণ একজন সফল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বর্তমানে আমেদাবাদে কর্মরত। পাশাপাশি সে একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক যার লেখা কবিতাগ্রন্থ ও সায়েন্স ফিকশনের (যুগ্ম সম্পাদনা) বই বাংলাদেশ ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত। ঋষি গৌরব ছদ্মনামে সে নানা ম্যাগাজিনে ও অনলাইন ম্যাগাজিনে নিয়মিত লেখে। পিতা হিসেবে আমি মনে করি তার এ সমস্ত গুণার্জনের কৃতিত্ব যতখানি তার— ততোধিক কৃতিত্ব তার প্রথমবিদ্যা অর্জনের বিদ্যাপীঠ বাঁকুড়া সরস্বতী শিশুমন্দিরের। আমার কনিষ্ঠপুত্র অনুভব চৌধুরীও এই শিশুমন্দিরের প্রাক্তন বিদ্যার্থী। বর্তমানে একাদশ শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগে পাঠরত। যেটুকু ভালোর সে অধিকারী তারও কৃতিত্ব বাঁকুড়া সরস্বতী শিশু মন্দিরের। ঈশ্বরের কাছে শিশুমন্দিরের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

প্রাক্তন অভিভাবক
বাঁকুড়া বড়কালীতলা সরস্বতী শিশুমন্দির

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

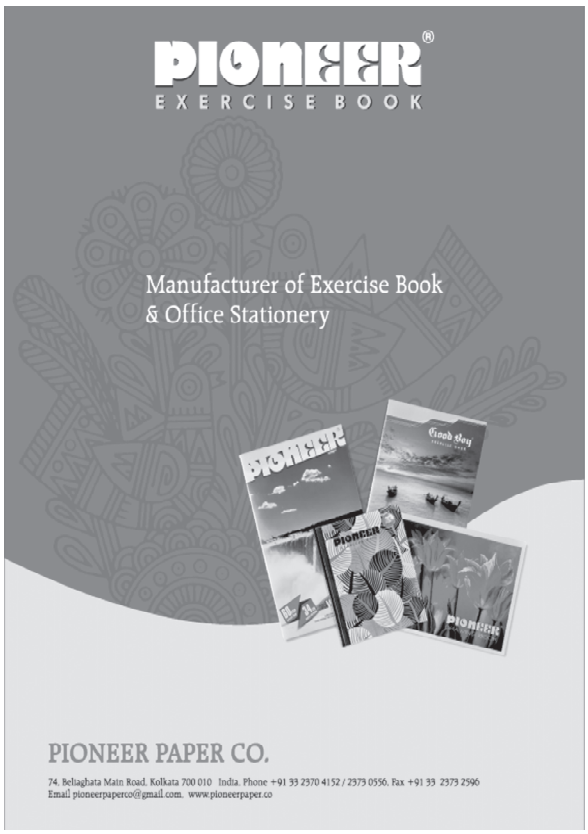

‘ভারতে প্রত্যেক কৃষক, বাজারের প্রত্যেক দীনতম ব্যক্তি চিত্রের মর্ম উপলব্ধি করে, চিত্র ভালবাসে, ভালবাসে অলঙ্কৃত পাত্র, মূর্তি অথবা যে কোনো প্রকারের প্রতীক শিল্প। শিল্পকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি ইতালীর মতো এদেশেও পূর্ণতা লাভ করেছে। এখানকার মূর্তিপূজার প্রাচীন প্রথা, চোখে দেখার চেয়ে হৃদয়ে চিত্রের মর্মগ্রহণ করার পথকে সহজ, সংক্ষিপ্ত এবং সুদূরগামী করেছে।’

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

আমি এখনও শিশুমন্দির পরিবারের সদস্য

স্মৃতি সবসময়ই সুখের। সেই চার বছর বয়সে বাবা মায়ের হাত ধরে মুর্শিদাবাদ জেলার কাশিমবাজার লাধুরাম তোষণিওয়াল সরস্বতী শিশু মন্দিরের অঙ্কুর শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে ভর্তি হলাম। আমার প্রিয় শিশুমন্দিরের বড় দাদাভাই (প্রধানাচার্য) আমাকে স্বস্তিকা পত্রিকার জন্য শিশুমন্দির সম্পর্কে কিছু লেখার জন্য যখন বললেন তখন আমি খুবই আহ্লাদিত হই। ভাবতে বড় ভাল লাগছে, প্রথম দিন থেকেই শিশুমন্দিরের দাদাভাই দিদিভাইদের অকৃত্রিম স্নেহ-ভালোবাসা আমার শিশুমনকে জয় করে নিয়েছিল। তারপর থেকেই নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাওয়ার দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করতাম। রবিবারের ছুটির দিনেও বাড়িতে থাকতে মন চাইত না।

আমি লক্ষ্য করেছি, এই শিশুমন্দির কিন্তু কচি শিশুমনে কখনওই পঠনপাঠনের ভার চাপিয়ে দেয়নি। গান-গল্প-খেলাধুলার মাধ্যমে আগে শিশুমনকে পঠনপাঠনের উপযোগী করে গড়ে নিয়ে তবেই পাঠদান করা হয়। বিদ্যালয়ে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে শিশু ভাই-বোনদের চরিত্র গঠন, শারীরিক ও মানসিক বিকাশ অর্থাৎ শৈশবকাল থেকেই সর্বাঙ্গীণ বিকাশের প্রতি তাঁরা অত্যন্ত যত্নশীল। প্রতিদিন বিদ্যালয় প্রার্থনা-সঙ্গীত দিয়ে শুরু, টিফিনের আগে একসঙ্গে ভোজনমন্ত্র ও সবশেষে রাষ্ট্রবন্দনা দিয়ে পঠন-পাঠন সমাপ্ত হোত। এতে আমাদের মনে হোত আমরা একই পরিবারের সন্তান।

শুধু পড়াশোনাই নয়, এর পাশাপাশি বিনোদনেরও কমতি ছিল না। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেমন, রবীন্দ্রজয়ন্তী, রাখিবন্ধন ও বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিশু ভাইবোনদের নাচ, গান, শারীরিক প্রদর্শনী, নাটক ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী করার প্রতি আন্তরিক প্রয়াস চোখে পড়ার মতো ও মনে রাখার মতো। প্রতি বছর সরস্বতী পুজো, বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও প্রসাদ খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে থাকতাম। দেখতে দেখতে অঙ্কুর, কিশলয়, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ছয়টা বছর কেটে গেল। চতুর্থ শ্রেণীতে মায়াপুর ভ্রমণ ও সেখানে সবাই মিলে একসঙ্গে চড়ুইভাতি করা আমাদের মনকে অফুরন্ত আনন্দ দিয়েছিল। শিশুমন্দির থেকে বিদায় নেওয়ার সময় দাদাভাই-দিদিভাইদের স্নেহের শাসন, আদর ও ভালোবাসা ছেড়ে যেতে মন চাইছিল না। ডুকরে কেঁদে উঠেছিলাম। বহরমপুর কাশীশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হলাম। এখানে এসে নিজেকে মা-হারা সন্তানের মতো মনে হলো। যেন মনে হলো কাউকে হারিয়ে এসেছি। কোথাও যেন কিছু ফেলে এসেছি। ক্রমশ ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি শিশুমন্দির মাধ্যমিক স্তরে সরকারি স্বীকৃতি পেল। আমরা ২০০৯ সালে শিশু মন্দির থেকে চলে আসার পর দ্বিতীয় শ্রেণী থেকেই কম্পিউটার শিক্ষা চালু হয়েছে। যার ফলে শিশুকাল থেকেই ভাইবোনেরা কম্পিউটার শিক্ষায় বিশারদ হবে ভাবতেও খুব আনন্দ হচ্ছে। এই শিশুমন্দির থেকেই তৈরি হয়ে অনেক দাদা ও দিদিভাই শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরে ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। আজও তাঁরা শিশুমন্দিরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আসেন ও শিশুমন্দির নিয়ে গর্ববোধ করেন। শিশুমন্দির আমাদের আত্মার আত্মীয়ে পরিণত হয়েছে।

আজ আমাদের দেশে প্রতিটি প্রদেশের জেলায় জেলায় অসংখ্য শিশুমন্দির গড়ে উঠেছে। সমস্ত শিশুমন্দিরের চিন্তাধারা এক এবং একসূত্রে গাঁথা। তাই আজও আমার মনে হয় এখনও আমি শিশুমন্দির পরিবারের মধ্যেই রয়েছি।

তনুশ্রী ঘোষ, প্রাক্তন ছাত্রী
শিশুমন্দির।

অমলিন স্মৃতি

আজকের প্রতিযোগিতার দুনিয়ায় ছোটরাও যখন তথ্যনিষ্ঠ এবং পাশ্চাত্যের ভোগসর্বস্বতাকে অনুকরণ করছে, বিদ্যাভারতীর সরস্বতী বা সারদা শিশু মন্দিরগুলি কিন্তু এক্ষেত্রে আজও এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। ১৯৯৭ সালে মালদহের অরবিন্দ পার্ক সরস্বতী শিশু মন্দির থেকে আমার চতুর্থ শ্রেণী উত্তীর্ণ হয়ে বেরিয়ে আসা, কিন্তু আজ প্রায় দু' দশক পরেও আমার মনে সেই স্মৃতি অমলিন। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত মন্দির হলো সরস্বতী শিশু মন্দিরে। সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে দিনের সূচনা আর বন্দেমাতরমের দেশাত্মবোধ-সিক্ত মন নিয়ে ঘরে ফেরা, গুরুজনদের সম্মান করা, দাদা-দিদির সঙ্গে ভাই-বোনের সম্পর্ক আর ছোট ছোট সংস্কারগুলির মাধ্যমে চরিত্র গঠন— এসবই শিশুমন্দিরের অবদান। আজকের গতানুগতিক আর পাশ্চাত্যানুসারী শিক্ষার বাইরে গিয়ে জাতিগঠনের বীজ রোপণের এই প্রয়াস শিশু মন্দিরে অব্যাহত থাকুক— ভারতমাতার কাছে এই প্রার্থনা করি।

সোহম চৌধুরী, প্রাক্তন ছাত্র,
মালদহ অরবিন্দ পার্ক সরস্বতী শিশুমন্দির

সরস্বতী শিশু মন্দিরের পথে

আমাদের মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের ছাদে বসে বহু পড়ন্ত বিকেলেই হয়ে উঠত নস্টালজিক, সতীর্থদের সঙ্গে স্মৃতিরোমন্থনে। ফেলে আসা দিনের যেসব রঙীন ছবি আমার মনে আজও বল যোগায় আর বন্ধুদের করত উদ্ভাসিত, তার অনেকগুলোই ছিল এক মন্দিরের। রোজ সকালে যেতাম, পিঠে বইয়ের ব্যাগ, ঘাড়ে জলের বোতল। সরস্বতী শিশু মন্দির— বাঁকুড়া বড়কালীতলা। নীল প্যান্ট, সাদা জামা। প্রতি শুক্রবার দুটোই সাদা। জামার বুকে বাঁদিকে ব্যাজে আঁকা— 'একটি শিশু এক সিংহের ঘাড়ে চড়ে সিংহটার সঙ্গে খেলা করছে, আর নীচে লেখা 'স্বয়মেব মৃগেন্দ্রতা'। জুতো খুলে রাখা সার সার র‍্যাকে বিশেষ ক্রমাঙ্ক মেনে। অঙ্কুর, কিশলয়, ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ। সমস্ত কক্ষ ছিল মহাপুরুষ বা মহিয়সীদের নামে। ছোটো থেকেই ছিল সংস্কৃত, ইংরেজি, রামায়ণ, মহাভারত, সাধারণজ্ঞান, অঙ্কন, শরীরচর্চার শিক্ষা অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে। ওখানে কোনো স্যার বা ম্যাডাম ছিলেন না, ছিলেন দাদাভাই-দিদিভাইরা, যেন মন্দিরের পূজারি— ধুতি-পাঞ্জাবি, আর লালপাড় সাদা শাড়িতে সে যে কী স্নেহ আর আদরের ছোঁয়া! মাসান্তে দাদাভাই-দিদিভাইরা বাড়িতে এসেও বাবা-মা'র কাছে আমাদের খবর নিতেন কোলে বসিয়ে। রোজ দিন শুরু হোত একাত্মতাস্তোত্রম্, সরস্বতী বন্দনা, সুভাষিতম্ দিয়ে। মাঝে স্বল্পাহারের শুরুতে ভোজনমন্ত্র উচ্চারণ অধৈর্য চিত্তে। সবশেষে রাষ্ট্রবন্দনা— সম্পূর্ণ বন্দেমাতরম্। প্রতি শনিবার সবশেষে হোত শিশুসভা। কামরাঙা তলায় বড় গোল একটা বেদি ছিল স্টেজ, যে যার মতো একে একে গান, আবৃত্তি, নাটক, মূকাভিনয় করার সুযোগ পেতাম। প্রতি বছর হোত সাংস্কৃতিক উৎসব। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, রাখিবন্ধন উৎসব, সরস্বতী পুজো, বনভোজন, স্বাস্থ্য পরীক্ষা আর বছরে দুবার পরীক্ষা উৎসব তো থাকতই। এছাড়াও হোত বিজ্ঞান উৎসব, গণিত মেধা ও সংস্কৃত মেধার পরীক্ষা, কোনো গীতার অধ্যায় পাঠের প্রতিযোগিতা। বেল, টগর, জবা, কামরাঙা গাছে সাজানো আমাদের বাঁকুড়া-বড়কালীতলার সরস্বতী শিশু মন্দির এক অন্যতম আকর্ষণ— এটা ছিল এক বৈপ্লবিক বাড়ি। দোতলায় ডানদিকের এক কক্ষে ছিল গভীর সুড়ঙ্গের প্রবেশ পথ, যা আমরা দাদাভাইদের বহু অনুরোধ করে দেখতে পেয়েছি। স্টিলের টিফিন বক্স-এ প্রতিফলিত সূর্যালোকে খোঁজার চেষ্টা করেছি গভীর অন্ধকারে ফেলে রাখা কোনো স্বাধীন ভারতবর্ষের অনুরাগীর পায়ের চিহ্ন। এখনও তোমায় খুঁজি শিশু মন্দির! সহস্র স্মৃতির ভিড়ে মনুষ্যত্বের তাড়নায়।

—ডাঃ অনিন্দ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন ছাত্র,
বড়কালীতলা শিশুমন্দির, বাঁকুড়া।

আমার চোখে নকশালবাড়ি সারদা বিদ্যামন্দির

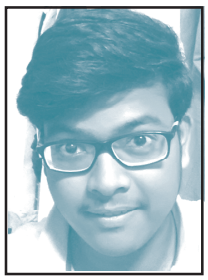

আমি দিগন্ত সরকার। নকশালবাড়ি সারদা বিদ্যামন্দিরের একজন প্রাক্তনী। বর্তমানে আই আই টি খড়্গপুরের প্রথম বর্ষের ছাত্র। আমি খুব গর্বিত যে ১৯৯৯ সালে যে সারদা শিশুতীর্থ গুটি গুটি পায়ে পথ চলতে শুরু করেছিল, আজ সেই বিদ্যালয়টি নকশালবাড়ি তথা গোটা উত্তরবঙ্গের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছে। আমার এটা বলতেও দ্বিধা নেই যে আমার যাবতীয় সাফল্যের পেছনে সারদা বিদ্যামন্দিরের গুরুত্ব অপরিসীম। এখন জীবনের উনিশটি বসন্ত পার করে দেওয়ার পরে মনে হয় যে প্রতিটি পদক্ষেপে আমায় এই বিদ্যালয় আমার অজান্তেই সহায়তার হাত বাড়িয়ে রেখেছে। এই বিদ্যালয়ে পড়াশুনার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের চর্চা হয় যা একজন বিদ্যার্থীর পরিপূর্ণ জীবন গঠনে সহায়ক হয়ে ওঠে। তাছাড়াও বিদ্যালয়ের নিয়মকানুন, আদবকায়দা যেমন আমাদের সকলকে সুষ্ঠু পরিবেশে বড় হতে সাহায্য করেছিল; পাশাপাশি বিদ্যালয়ের জন্য নিবেদিতপ্রাণ দাদা ও দিদিরা কখনো বিদ্যালয়ে মা-বাবার অভাব বুঝতে দেননি। শিশুভারতী কার্যক্রমের মাধ্যমে আমাদের কিছু কিছু দায়িত্ব দেওয়া হোত যা সঠিকভাবে পালন করে আমরা বিদ্যালয়ের প্রতি দায়িত্ব পালন করতাম। আমি শিশুভারতীর প্রধান হয়েছিলাম বলে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার একটা সহজাত ক্ষমতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল সেই ছোটবেলা থেকেই। এর ফলে পরবর্তীতে নেতৃত্ব দিতে কখনো অসুবিধে হয়নি। মাঝেমধ্যে শিশুশিবিরের আয়োজন করা হোত যা আমাকে পরবর্তীতে মা, বাবা, বোনকে ছেড়ে আবাসিক বিদ্যালয়ে থাকতে সাহায্য করেছে। বিদ্যালয়ে পড়ার ফলে কর্তব্যবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, সহমর্মিতা গড়ে ওঠে, যা বর্তমান সমাজের একজন আদর্শ নাগরিকের থাকা উচিত। আমি আশা করি, এই বিদ্যালয় আরো বড় হয়ে উঠুক, ভারতমাতার অনেক আদর্শ সন্তান গড়ে তুলুক। আমি আমার বিদ্যামন্দিরের কাছে ভীষণভাবে ঋণী। ভবিষ্যতে এই বিদ্যামন্দিরের যে-কোনো ভালো কাজে অংশগ্রহণের জন্য আমি উদগ্রীব হয়ে রইলাম।

দিগন্ত সরকার, *প্রাক্তন ছাত্র, নকশালবাড়ি সারদা বিদ্যামন্দির*

অমলিন স্মৃতি

এটা খুব আনন্দের যে অতীতের দিনগুলিতে ফিরে গিয়ে একবার পুরনো স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলা। কর্মব্যস্তময় জীবনের অবসরে চোখ বুজলেই ভেসে ওঠে শৈশবের সেইসব অনাবিল আনন্দঘন সোনার দিনগুলি। শৈশবের দিনগুলির কথা মনে পড়লেই বিদ্যালয়ের দিনগুলি মানসপটে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মায়ের হাত ধরে প্রথম পা রেখেছিলাম সরস্বতী শিশুমন্দির বিদ্যালয়ে। মাকে ছেড়ে শ্রেণীকক্ষে বেশ অনেকক্ষণ থাকতে হবে ভেবেই আমার দুই চোখে জল এসে গিয়েছিল। অশ্রুভেজা চোখে শ্রেণীকক্ষে বসেছিলাম। সঙ্গে আমার বয়সী অনেক শিশু কেউ কাঁদছে, কেউ বা মনখারাপ করে বসে আছে, কেউ আবার বেশ উৎফুল্ল। এমন সময় শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করলেন একজন দিদিমণি। পরমস্নেহের সঙ্গে আমাদের আপন করে নিলেন। মজার ছড়া, গল্পের মাধ্যমে মন ভরিয়ে দিলেন আনন্দে। কীভাবে যে বেশ কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছিলাম বুঝতেই পারিনি। সেই প্রথম দিন থেকে ছ' বছর অতিবাহিত করেছি শরৎপল্লী শিশুমন্দিরে। এই শিশুমন্দিরের সমস্ত আচার্য ও আচার্যা পরম স্নেহের সঙ্গে শিশুদের আপন করে নেন। বর্তমানে আমি সেই শরৎপল্লী শিশুমন্দিরের একজন আচার্যা। প্রাক্তন ছাত্রী হিসেবে শিশুমন্দির সম্পর্কে দু'চার কথা লেখার মাধ্যমে মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখা শৈশবের স্মৃতিগুলি ব্যক্ত করার সুযোগ পেয়েছি। তবে দু'চার কথায় শিশু মন্দিরের সঠিক মূল্যায়ন করা কখনই সম্ভব নয়। আমার জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলির মধ্যে অন্যতম হলো, শিশু মন্দিরে আচার্যা হিসেবে প্রবেশ। এটি আমার কাছে গর্বেরও বটে, কারণ যে শিশুমন্দিরে আমি শিক্ষা গ্রহণ করেছি সেখানে আমি শিক্ষাদান করার সুযোগ পেয়েছি। এমনটা খুব কম মানুষের জীবনে ঘটে।

শিশুমন্দির নিজ বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। শৃঙ্খলা, সংস্কার, নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ— এক কথায় সার্বিক চরিত্রগঠনের সমস্ত দিকগুলিতে এখানে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিশুর সার্বিক বিকাশে শিশুমন্দির অতুলনীয়, অদ্বিতীয়। আধ্যাত্মিকতার জাগরণ ঘটে এখানে। বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে কয়েক শো শিশু প্রাণ। আমাদের শিশুমন্দির প্রকৃত মানুষ গড়ার লক্ষ্যে ব্রতী। বিভিন্ন উৎসব, অনুষ্ঠান, মনীষীদের জন্মদিন, প্রয়াণদিন পালন প্রভৃতির মাধ্যমে শিশুমনে কখন কীভাবে দেশপ্রেম, সংস্কৃতি, রুচি, আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ঘটে যায় তা বলে প্রকাশ করার নয়। প্রার্থনার মাধ্যমে বিদ্যালয় শুরু এবং মাতৃবন্দনার মাধ্যমে হয় সমাপন— এমন পরিবেশ অন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হয় আছে কিনা আমার জানা নেই। শিক্ষা শুধু পুঁথিগত নয়, শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন সার্বিক। মনের মলিনতা দূর করা সম্ভব শিক্ষার মাধ্যমেই। একমাত্র জ্ঞানের আলোকেই মনের অন্ধকারকে দূর করা সম্ভব। আমার মতে এদিক থেকে শিশুমন্দির আদর্শ।

—মিতাক্ষী পাল চৌধুরী, প্রাক্তন ছাত্রী,
সরস্বতী শিশুমন্দির, শরৎপল্লী, মেদিনীপুর।

স্মৃতিপটে আমার শিশুমন্দির

বাঁকুড়া শহর কেন্দ্রস্থিত বড়কালীতলা সরস্বতী শিশু মন্দির গড়ে উঠেছে শতাব্দী প্রাচীন বৈপ্লবিক ইমারতে। শত শত ভাইবোনের বিদ্যামন্দির, আমারও শৈশবের স্মৃতিমেদুর শিশুমন্দির। নিত্যদিনের আনাগোনায় সেই মন্দিরবাড়ির বহু স্মৃতি আজও উঁকি দেয় মনের জানালায়। সোম থেকে শনি নিত্য সকালে বইয়ের ব্যাগ এবং জলের বোতল হাতে যেতাম মায়ের সঙ্গে শিশুমন্দিরে। পরে অবশ্য দিবাবিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে সারদা শিশু মন্দিরের বান্ধবীদের সঙ্গেই যাওয়া হোত। নানাবিধ গাছের ছায়ায় সেই প্রাঙ্গণ সত্যিই এক মন্দিরসুলভ পরিবেশ সৃষ্টি করত। সরস্বতী বন্দনা, একাত্মতাস্তোত্রম ও নানাবিধ সুভাষিতম্-এর মধ্য দিয়ে আমাদের বিদ্যাবন্দনা হোত শুরু। দাদাভাই, দিদিভাইদের হার্দিক সহায়তায় অঙ্কুর, কিশলয়, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর পাঠক্রম আত্মস্থ করা এবং প্রথমবার প্রথম হওয়ার অনুভূতি আজও মনকে এগিয়ে যাওয়ার ইন্ধন জোগায়। নানাবিধ অনুষ্ঠান যেমন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, রবীন্দ্রভবনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বনভোজন এবং পরীক্ষান্তে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ছিল বার্ষিক শিক্ষাদানের পাঠক্রমে। তাছাড়া সপ্তাহান্তে 'শিশুসভা' ছিল আমার খুবই প্রিয়। রামায়ণ, মহাভারত এবং সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণের মধ্য দিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে এ এক অনন্য পরিবেশ রচনা হোত। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, বাবার কাছে শোনা, বিদ্যালয়ের শতাব্দী প্রাচীন গৃহ আমাদের পূর্বপুরুষরা স্বদেশী কর্মযজ্ঞের জন্য সমর্পণ করেন। নিত্য পাঠক্রমের সমান্তরালে নানাবিধ শরীরচর্চা, খেলাধুলা, আমাদের দৈহিক এবং মানসিক গঠন করত সুদৃঢ়। আজও মনে পড়ে মন্দির প্রাঙ্গণ ছেড়ে বাড়ি আসার আগে 'দাদাভাই নমস্কার' 'দিদিভাই নমস্কার' করার সেই শিশুসুলভ প্রাণোচ্ছল নিবেদন। শিশু না হলেও আজও আমরা শিশুমন্দিরের সঙ্গে যুক্ত ফেসবুক, হোওয়াটস্অ্যাপ-এর মাধ্যমে, যা আজও শিশুমনকে স্মৃতির আবেশে করে উদ্ভাসিত 'চরৈবেতি'র স্তুতিতে।

—দেবলীনা মুখার্জী, প্রাক্তন ছাত্রী, বড়কালীতলা শিশুমন্দির, বাঁকুড়া।

প্রণাম আমার বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরকে

শিশুকালেই আমার স্কুলজীবন শুরু হয় পুরুলিয়া জেলার বাগমুণ্ডী

বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরে। অঙ্কুর থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত আমি এই শিশুমন্দিরের ছাত্র ছিলাম। কিন্তু আজও আমার মনে হয় আমি এখনো এই বিদ্যালয়েরই ছাত্র। সেই শিশুকালের আচার্য ও আচার্যাদের স্নেহস্পর্শ আমি আজও অনুভব করি। বর্তমানে আমি সরকারি চাকুরে। আমার সহকর্মীরা বলেন আমি নাকি তাঁদের থেকে আলাদা। আমি মনে মনে বলি, হবেই তো! আমার জীবনের ভিত তৈরি হয়েছে যে বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরে! আজ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের শেখাতে হচ্ছে— দেশ সবার মা। তারা যদি শিশু মন্দিরে পড়ার সুযোগ পেত তাহলে শিশুকালেই তারা অনুভব করতো দেশই সত্যিকারের মা। এসবই আমি শিখেছি শিশুমন্দিরের আচার্য-আচার্যাদের থেকে। তাঁদেরকে আমার প্রণাম। প্রণাম আমার শৈশবের বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরকে।

—অজয় কুমার, প্রাক্তন ছাত্র, বাগমুণ্ডী, পুরুলিয়া।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

সারদার দাদা-দিদিরা এখনো আমার হাত ছাড়েনি

আমি রায়গঞ্জ সারদা বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তন ছাত্রী। আমি প্রতিষ্ঠানে যখন ভর্তি হয়েছিলাম তখন আজকের সারদা বিদ্যামন্দির সারদা শিশুতীর্থ নামেই পরিচিত ছিল। আমার প্রথম স্কুল জীবনে প্রবেশ দাদা-দিদিদের হাত ধরেই। এখন আমি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলজি বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পাঠরত। আমি মনে করি যে আমার এই এতটা পথ চলায় আমার সেই প্রাথমিক শিক্ষার অবদান সর্বাধিক। ভিত পাকাপোক্ত না হলে তাতে বাড়ি বানানো সম্ভব নয়। সত্যি কথা বলতে কী, ওই পরিবেশ, ওই দিনগুলোকে প্রচণ্ডভাবে 'মিস' করি। আর হয়তো সেই দিনগুলো কখনই ফিরে পাবো না। এখন আর মহাপুরুষদের গল্প শোনাবার মতো কেউ নেই। গল্পের ছলে জীবনে কী করে চলতে হয় সেই শিক্ষাটুকুও দেয় না আজ কেউ। আজ প্রায় ১২ বছর হয়ে গেল আমার বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসা, তবু দাদা-দিদিরা আমার হাত ছাড়েননি। বড়দার সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় নিয়মিত। আমিই হয় সময়বিশেষে সেটা ধরে রাখতে পারি না মাঝে মাঝে। এক কথায় আমার জীবন গঠনে সারদা শিশুতীর্থ (বিদ্যামন্দির)- এর অবদান হয়তো আমি কখনই গুছিয়ে ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। শুধু এটুকু বলতে পারি যে আমি চিরকৃতজ্ঞ আমার ছোটবেলার সেই ছোট্ট স্কুলটির কাছে, যা এখন আদৌ ছোটো নেই, বেশ বড়সড় মাপের হয়ে গেছে।

—জয়ন্তী ঝা, প্রাক্তন বোন, সারদা বিদ্যামন্দির, রায়গঞ্জ।

With Best Compliments from -

Basak Publication House

3, Sombhu Chatterjee Street
Kolkata - 700 007
Ph. 9831166649 / 9674277064

আমার শিশুমন্দিরের দিনগুলি

আমার বিবেকানন্দ শিশুমন্দির তার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে মানব সম্পদের উৎকর্ষ সাধনের কর্তব্যে অবিচল। শৈশব ও কৈশোরকে অতিক্রম করে ২৬-এর তরতাজা যৌবনের অধিকারী। শিশুমন্দিরে ছাত্রাবস্থা থেকে দাদা-দিদিদের আদর্শ, স্নেহ, সময়ানুবর্তিতা দেখে আমারও মনে হয়েছিল তাঁদের সংস্পর্শে থেকে একসঙ্গে ভগবান সুলভ শিশুদের জন্য সময় দেওয়ার। আজ আমি শিশুমন্দিরের স্নেহের ভাই-বোনদের সেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরে সত্যি ধন্য। সময় কী এবং সময়কে কী করে ব্যবহার করতে হয় তা আমি এই শিশুমন্দির থেকে শিখেছি। নিজেকে ও পরিবারে সংস্কার তৈরি করার একটি সুবিশাল মঞ্চ আমার মনে হয় এই শিশুমন্দিরই। এটাই সত্যিকারের ভগবানের মন্দির।

স্বাধীন সাহা (প্রাক্তন ভাই)
বিবেকানন্দ শিশু মন্দির
বাচামারী গভঃ কলোনী, মালদহ

সবার প্রিয় ®
বিল্লদা
চানাচুর
'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর, জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

আমার লালকুঠিপাড়া সরস্বতী শিশুমন্দির

আর পাঁচ জন শিশু জন্মগ্রহণ করার পর, তাদের মুখের প্রথম শব্দ ফোটে 'মা' শব্দ দিয়ে। আর সেই মা ডাক একজন মা'-র কাছে এক বিশাল আনন্দের অনুভূতি। সেই অনুভূতি, সেই আনন্দ কোনো ভাবেই, কোনো কিছুর দ্বারা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আমার মা-ও ব্যতিক্রম নয়। সালটা ১৯৯২, আমার বয়স তখন মাত্র চার। আমার মা আমার ছোট্ট ছোট্ট আঙুল ধরে একটা স্কুলে নিয়ে যান, আমার প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ শুরু করতে। প্রথম দিনের স্মৃতি পুরোটা মনে পড়ছে না। কিন্তু আজ ২০১৬ সাল দাঁড়িয়ে এটুকু বলতে পারি যে ১৯৯২ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত আমার সাধের এই লালকুঠীপাড়া শিশু মন্দিরের পুরনো স্মৃতির টুকরোগুলো জোড়া লাগিয়ে যে কোলাজটা আমি আমার হৃদয়ে তৈরি করেছি, সেই কোলাজটা বড় সুন্দর আর রঙীন। একটা বাড়ি তখনই মজবুত হয়, যখন তার ভিত শক্ত থাকে। ভিত নরম হলে বিপদ অনিবার্য। আমার শিশুমন্দির আমার মতো অনেক ছাত্রছাত্রীর পড়াশুনার ভিতটা সুদৃঢ় ও মজবুত করেছে। ছাত্রজীবনে প্রথমেই দরকরা শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা, যেটা আমার বিদ্যালয়ে প্রথমেই বেশি করে শেখানো হয়। আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই প্রধান আচার্য শ্রীমানব দাদাভাইকে, তার অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য। একটা ক্রিকেট ম্যাচ জিততে গেলে শুধু ক্যাপ্টেনের পারফরমেন্সই যথেষ্ট নয়, দরকার টিমের সকল সদস্যের অদম্য প্রয়াস। তাই মানব দাদাভাই-সহ আমার শিশুমন্দিরের সকল দাদাভাই, দিদিভাইকে জানাই প্রণাম ও শুভেচ্ছা।

—শ্রেয়সী ব্যানার্জী, প্রাক্তন ছাত্রী, লালকুঠিপাড়া অধুনা অরবিন্দপল্লী সরস্বতী শিশুমন্দির।

নির্মল বুক এজেন্সি মানেই
ছোটদের জন্য রঙিন মজার বই
নির্মল বুক এজেন্সি
২৪বি, কলেজ রো, কলকাতা - ৭০০ ০০৯
দূরভাষ : (০৩৩) ২২৪১ ৩৬৮৮
ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১ ৩৩৩৮

একবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে প্রেরণাপুরুষ ডাঃ হেডগেওয়ার

বিরাজ নারায়ণ রায়

ঊনবিংশ শতাব্দী ও তার পরবর্তী সময়কালে ভারতের জাতীয়তাবাদী ভাবনা আবর্তিত হয়েছিল বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করে। সেই সময় যুবসমাজের বুকে দেশপ্রেমের তুফান তুলেছিলেন তিনি। সমাজ গঠনের জন্য তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঘর ছেড়েছিল না জানি কত যুবক। তারই মধ্যে একজন ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার, যাঁর কাজ ও আদর্শ বদলে দিতে চলেছে একবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষকে। ১৯৪০ সালে তিনি প্রয়াত হন, কিন্তু প্রয়াণের এত বছর পরেও ভারতের সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনে ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে এই প্রেরণাপুরুষের ছায়া।

ডাঃ হেডগেওয়ার নামটি দেশের সাধারণ মানুষের কাছে খুব পরিচিত নয়। পরিচিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁর নিজেরও ছিল না। ব্যক্তি-হেডগেওয়ারকে মানুষ যতটা না চেনে তার থেকে বেশি জানে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে (আর এস এস)। বৈভবশালী ভারত গঠনের লক্ষ্যে ১৯২৫ সালে মহারাষ্ট্রের নাগপুরে তিনি সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন, বর্তমানে যা মহীরুহে পরিণত হয়েছে। অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে যদি তাঁর মৃত্যু পরবর্তী কর্মপ্রবাহকে পর্যালোচনা করা যায় তাহলে দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে বলা যেতে পারে যে একবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ যে পথে চলতে শুরু করেছে তা ডাঃ হেডগেওয়র প্রদর্শিত পথ।

ডাঃ হেডগেওয়ারের জন্ম মহারাষ্ট্রে হলেও তাঁর চিন্তার মূল ভিত্তিভূমি ছিল এই বাংলা। রাষ্ট্র নির্মাণের যে ধারণা তিনি দিয়ে গেছেন সেটির স্ফুরণ ঘটেছিল এখানেই। সময়টা ১৯১০ সালের মাঝামাঝি। ডাক্তারি পড়তে মহারাষ্ট্র থেকে কলকাতায় এলেন যুবক কেশব। তখন স্বাধীনতা আন্দোলনের পীঠস্থান কলকাতা। চারিদিকে উত্তাল পরিস্থিতি। অতি দরিদ্র ঘরের কেশব

ছোটবেলাতে বাবা-মাকে হারিয়ে কাকার কাছে মানুষ। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বভাব ও ব্যবহারে সবাই বুঝে গিয়েছিল এ ছেলে সংসারি হওয়ার নয়, ওর জন্য অপেক্ষা করছে অন্য কিছু। তাঁর কলকাতায় আসার উদ্দেশ্য শুধু ডাক্তারি পড়া ছিল না। এখানে এসেই তিনি যোগ দিলেন অনুশীলন সমিতিতে। জড়িয়ে পড়লেন সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে। ভারতের 'ইউথ আইকন' বিবেকানন্দ ততদিনে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর অসম্পূর্ণ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। যুবক কেশব আকৃষ্ট হলেন সেই দিকে। বিবেকানন্দের ভাবনা তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করল। বিবেকানন্দ বলেছিলেন— 'মানুষ চাই, মানুষ, আর সব হইয়া যাইবে। বীর্যবান সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্বী, বিশ্বাসী যুবক আবশ্যক। এইরূপ একশত যুবক হইলে সমগ্র জগতের ভাবস্রোত ফিরাইয়া দেওয়া যায়'। কথাটি বড় মনে ধরেছিল কেশবের। সে সময় বিপ্লবী নেতাদের কেবল একটাই লক্ষ্য ছিল, যে করেই হোক দেশকে স্বাধীন করতে হবে। কিন্তু কেশবের ভাবনা ছিল তাঁদের থেকে অনেক এগিয়ে। সেই সময় দাঁড়িয়েই তিনি ভাবতে শুরু করেছিলেন স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যতের কথা। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আন্দোলন যে পথে এগোচ্ছে তাতে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই, কিন্তু সেই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দেশবাসী কতটা তৈরি? এমন মানুষ কোথায় যারা সমর্পিত ও নিঃস্বার্থভাবে দেশের জন্য কাজ করবে? ডাক্তারি পড়া শেষ করে তিনি ফিরে গেলেন মহারাষ্ট্রে। প্রতিষ্ঠা করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। বিবেকানন্দ যে মানুষ চেয়েছিলেন, সেই মানুষ গড়ার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। বিবেকানন্দের আর একটি কথাকে তিনি মনেপ্রাণে আত্মস্থ করেছিলেন— এমন একটি সংগঠনের প্রয়োজন যারা আমাদের ভালো গুণগুলি আদর করে শেখাবে। বিবেকানন্দের এই ভাবনার বাস্তব প্রতিফলন ঘটালেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংগঠনে। মানুষের মধ্যে সদ্‌গুণের বিকাশ ঘটিয়ে দেশপ্রেমিক ব্যক্তি নির্মাণের এক অভিনব পদ্ধতির সূচনা করলেন তিনি, যা সমর্থ ভারত গঠনের জন্য বর্তমান প্রজন্মের কাছে এক আশাপ্রদ পথপ্রদর্শন।

ডাঃ হেডগেওয়ার তাঁর জীবৎকালেই সংগঠনের কাজকে সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সংগঠনের দায়িত্বে আসেন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এম এস গোলওয়ালকর। বহু বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে তিনি সংগঠনের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যান। ১৯৪৮ সালে গান্ধী হত্যার মিথ্যে অপবাদ আসে সঙ্ঘের উপর। ফলে সাময়িক অবিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি হলেও সঙ্ঘ আবার ঘুরে দাঁড়াতে সমর্থ হয়। গোলওয়ালকরের সুদূরপ্রসারী চিন্তায় আর এস এস-র সঙ্গে যুক্ত করা হতে থাকে দেশের বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রগুলিকে, তৈরি হয় নতুন নতুন সংগঠন। সমাজের প্রান্তিক মানুষের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছোতে থাকে ডাঃ হেডগেওয়ারের রাষ্ট্র নির্মাণের ভাবনা। বর্তমানে প্রায় পঞ্চাশটিরও বেশি সর্বভারতীয় সংগঠন ডাঃ

হেডগেওয়ারের আদর্শকে সামনে রেখে সেই লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। অর্থাৎ তাঁর চিন্তার মূল বাস্তবায়ন ঘটতে শুরু করেছে তাঁর মৃত্যু পরবর্তী সময়ে।

সমাজের মুখ্য যে জায়গাগুলিতে হেডগেওয়ারের আদর্শের বেশি প্রতিফলন হয়েছে সেগুলি হলো— সেবা, সামাজিক সমরসতা, শিক্ষা ও রাজনীতি।

ভারতীয় জীবনধারার একটি অন্যতম মূল এদেশের দর্শন। যুগ যুগ ধরে এর উপর ভিত্তি করেই ভারতবর্ষের সমাজ ও রাজনৈতিক জীবন আবর্তিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন অনুসারে মহাপুরুষরা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন নানা পন্থ-সম্প্রদায়ের। এই ভিন্ন ভিন্ন পন্থ- সম্প্রদায়গুলির কাজের অভিমুখও ভিন্ন ভিন্ন। বিগত ৫০ বছর ধরে এই সমস্ত ধর্মীয় ভাবধারাকে একদিশায় পরিচালিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। ভারতের প্রায় বেশিরভাগ ধর্মীয় সম্প্রদায় কোনো না কোনো ভাবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এই কাজকে ত্বরান্বিত করে চলেছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক এম এস গোলোয়ালকরের উদ্যোগে ১৯৬৪ সালে তৈরি হয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, আজ যা সমস্ত পন্থ ও সম্প্রদায়ের সম্মিলনের মঞ্চ। এই মঞ্চ থেকেই ভারতের বিশাল সন্ত সমাজ নিঃশব্দে রাষ্ট্র গঠনের কাজ করে চলেছে।

ভারতের উন্নতির একটি বড় অন্তরায় এদেশের মানুষের মধ্যে বৈষম্যভাব। এই বৈষম্যকে দূর করে সামাজিক সমরসতা নির্মাণের লক্ষ্যে হেডগেওয়ার অনুপ্রাণিত সংগঠন বনবাসী কল্যাণ আশ্রম ও তার কিছু সহযোগী সংগঠন প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। উদ্দেশ্য, মানুষের পরিচয়কে জাত-পাত, ছুঁয়াছুঁতের ঊর্ধ্বে তুলে আনা, যাতে সমাজের তথাকথিত নীচু শ্রেণীর মানুষটিও নিজেকে বৃহত্তর সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন মনে না করে। পাহাড় জঙ্গলে বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে যেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো ন্যূনতম পরিষেবাটুকু পৌঁছয়নি সেখানে পৌঁছে গেছে বনবাসী কল্যাণ আশ্রম। দেশের মোট ৩৭৭টি বনবাসী অধ্যুষিত জেলার মধ্যে ৩২৫টি জেলায় চলছে এই সংগঠনের কাজ।

একই আদর্শ নিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে কাজ করছে বিদ্যা ভারতী, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ-র মতো শিক্ষা বিষয়ক সংগঠন। সারাদেশে এমন বিদ্যা ভারতী পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা ২৪৩৬৪টি। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে ৩১৪টি। ছাত্রদের মধ্যে দেশপ্রেম ও প্রকৃত ছাত্রস্বার্থ রক্ষায় ১৯৪৮ সালে তৈরি হয়েছিল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। বর্তমানে যেটি দেশের বৃহত্তম ছাত্র সংগঠন। শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের নিয়ে সংগঠন শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের সদস্য সংখ্যাও প্রায় ৮ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উপর সবচেয়ে বড় আঘাতটি এসেছিল ইংরেজ শাসনকালে মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষা নীতির মাধ্যমে। ফলে দেশের শিক্ষা প্রণালী থেকে বাদ পড়ে গেছে ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ। ভারতের শিক্ষাকে বিদেশি প্রভাব থেকে মুক্ত করে ভারতের শাশ্বত মূল্যবোধ সমন্বিত শিক্ষা প্রবর্তনের লক্ষ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে একযোগে কাজ করছে হেডগেওয়ার অনুপ্রাণিত এই সংগঠনগুলি। বর্তমানে বিজেপির প্রতি মানুষের বিপুল সমর্থন শুধু বিজেপি কিংবা ব্যক্তি মোদীর ক্যারিশ্মা নয়, এটি ডাঃ হেডগেওয়ার প্রদর্শিত পথের গ্রহণযোগ্যতা। প্রধানমন্ত্রী নিজে প্রত্যক্ষভাবে হেডগেওয়ারের আদর্শে অনুপ্রাণিত। তাই মোদী ও তাঁর মন্ত্রীসভা ভারতের হিতে যা করছে তা ডাঃ হেডগেওয়ারের ভাবনারই প্রতিফলন।

ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করছে বিজ্ঞান ভারতী। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে একটি বড় জায়গা দখল করে নিয়েছে সংস্কারভারতী। সংস্কৃত ভাষার প্রচার প্রসারে দেশের প্রথম সারিতে রয়েছে সংস্কৃতভারতী। এদের সক্রিয়তায় সারাদেশে প্রায় এক কোটি মানুষ আজ সংস্কৃত ভাষায় কথা বলছে। ক্রীড়া জগতে ক্রীড়া ভারতী, সীমান্তবর্তী এলাকায় সীমা জাগরণ মঞ্চ, মেয়েদের নিয়ে সেবিকা সমিতি, শ্রমিকদের মধ্যে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ, সহকার ভারতী এরকম বহু সর্বভারতীয় সংগঠন ও তাদের সঙ্গে যুক্ত দেশের এক বিরাট সংখ্যক মানুষ ডাঃ হেডগেওয়ারের আদর্শকে গ্রহণ করেছে। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো, বহুমুখী এই কাজের মধ্যে কোথাও কিন্তু ব্যক্তি হেডগেওয়ারের উপস্থিতি নেই, রয়েছে শুধু তাঁর চিন্তা ও আদর্শের প্রতিফলন।

শক্তিশালী রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য ডাঃ হেডগেওয়ার সমাজের সামনে যে ভাবনা রেখে গেছেন তার সফল বাস্তবায়ণ ঘটেছে সমাজের সেই মূল চারটি ক্ষেত্রে। ১৯২৫ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ডাঃ হেডগেওয়ার যে চিন্তার বীজ বপন করে গেছেন সেটি ছিল তাঁর এক অত্যন্ত আধুনিক মনস্কতার পরিচয়। মৃত্যুর ৭৫ বছর পরও তাঁর সেই চিন্তায় কোনো মলিনতা আসেনি, অতি আধুনিক এক পুরুষ যাঁর জীবনদর্শন ভারতের যুব সমাজকে আবার নতুন ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করেছে। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত নানাবিধ সংগঠন ও তাদের কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হচ্ছে তাঁর রাষ্ট্র ভাবনার আরও নতুন নতুন দিক।

ইদানীংকালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ নামক এই সংগঠনটির বিষয়ে যুবসমাজের মধ্যেও এক বিরাট কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, গত এক বছরে সারা দেশে প্রায় এক লক্ষ যুবক আর এস এস-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এই সংখ্যাটি দশ হাজার। এই হার যদি সমানে চলতে থাকে তাহলে আগামী দশ বছরে আর এস এস ভারতের যুবসমাজের এক বৃহৎ অংশে ডাঃ হেডগেওয়ারের ভাবাদর্শ পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে। তবে এর বিশালতা ও ব্যাপকতার জায়গাটি যেমন, তেমনি বিরোধিতা ও সমালোচনা কম নয়। কিন্তু সেই দিকগুলিকে বাদ দিয়ে যদি ডাঃ হেডগেওয়ারের জীবন দর্শন ও রাষ্ট্র নির্মাণের ভাবনার সঠিক বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে উপলব্ধি করা যাবে বর্তমান ভারতের জন্য তা কতটা উপযোগী। নতুন প্রজন্ম ইতিমধ্যে তা উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। ফলে দেশের সর্বস্তরে তাঁর আদর্শের যে জাল বিস্তৃত হয়েছে বা আরও হতে চলেছে তাতে নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে, এই একবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের ভাগ্য যাঁর আদর্শ ও চিন্তার মাধ্যমে নির্ধারিত হতে চলেছে তিনি হলেন ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার।

(বর্ষপদ তিথিতে ডা: হেডগেওয়ারের জন্মতিথি উপলক্ষে প্রকাশিত)

With Best
Compliments
from -

A
Well Wisher

B.M.

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
4 April - 2016 - Rs. 10.00

SURYA
Energising Lifestyles

WHY SURYA LED ?

Wide beam angle for better light spread

The Next-Gen Surya LED lighting provides many advantages in terms of

- Eco Friendly
- Instant Lighting
- Low Maintenance
- High Energy Efficiency
- High Power Factor
- Lasts upto 25000 hrs
- Wide Operating Voltage Range*

WARRANTY 2 YEAR WARRANTY
ON ALL LED PRODUCTS

5W MRP ₹350/-

www.surya.co.in

*voltage range 100V - 300V

SURYA ROSHNI LIMITED
Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi - 110008 (INDIA) Tel : +91-11-47108000, 25810093-96,
Fax : +91-11-25789560 E-mail : consumercare@sroshni.com
Call Toll Free No. : 1800-102-5657 Join us on facebook at www.facebook.com/suryaroshni and share your thoughts!

দাম : ১০.০০ টাকা